DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION

বাংলা ভাষার শিক্ষণশাস্ত্র

(দ্বিতীয় বর্ষ)

S9-H

बांग्ला भाषा का शिक्षणशास्त्र

(द्वितीय वर्ष)

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ (**SCERT**)

মহেন্দ্রু, পাটনা (বিহার)

বিষয় - বাংলা ভাষার শিক্ষণশাস্ত্র

বিষয় কোড - S9-H

দিক্‌নির্দেশক ঃ

* শ্রী দীপক কুমার সিংহ, আই. এ. এস. অপর মুখ্য সচিব, শিক্ষা বিভাগ, পাটনা, বিহার
* শ্রী সজ্জন রাজসেকর, আই. এ. এস. নিদেশক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, পাটনা, বিহার
* ড. এস. পি. সিন্‌হা, পরামর্শদাতা, শিক্ষা বিভাগ, বিহার, পাটনা

লেখকবৃন্দ ঃ

* ড. বর্ণালী বসাক, সহায়ক অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, রাজকীয় মহিলা মহাবিদ্যালয়, গর্দানীবাগ, পাটনা, বিহার
* ড. রাহুল সাহানা, লেকচারার, জেলা শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সংস্থান, শ্রীনগর, পূর্ণিয়া, বিহার

সমীক্ষক ঃ

* ড. রত্না ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত প্রাচার্য, জেলা শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সংস্থান, গয়া, বিহার
* ড. সাগর সরকার, সহায়ক অধ্যাপক (অতিথি / আংশিক সময়), বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা, বিহার

সংযোজক ঃ

* ড. স্নেহাশিস দাস, বিভাগাধ্যক্ষ, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, পাটনা, বিহার

বিষয় — বাংলা ভাষার শিক্ষণশাস্ত্র

বিষয় সূচি

একক	এককের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
1.	প্রারম্ভিক স্তরে বাংলা ভাষার স্বরূপ	1
2.	বাংলা ভাষা ও লিপির উৎস এবং গঠন প্রণালী	9
3.	বাংলা ভাষা শিক্ষণের বিভিন্ন দক্ষতা ও পদ্ধতি	31
4.	সাহিত্য শিক্ষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা	49
5.	বাংলা ভাষার দক্ষতা নিরূপণ	63

একক - 1

প্রারম্ভিক স্তরে বাংলা ভাষার স্বরূপ

* ভূমিকা
* উদ্দেশ্য
* ভাষা ভাব বিনিময়ের মাধ্যম
* ভাষা শিশুর জন্মজাত প্রবৃত্তি
* বাংলা ভাষা শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা
* বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিশ্বদর্শন
* ত্রিভাষা ও বহুভাষিকতা
* প্রারম্ভিক স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
* সারাংশ
* অনুশীলনী

'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একক -1

প্রারম্ভিক স্তরে বাংলা ভাষার স্বরূপ

ভূমিকা ঃ

বাংলা ভাষা বাঙালির মাতৃভাষা । শিশু জন্মের পর থেকেই পিতা-মাতা, অভিভাবক বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে যে ভাষা প্রথম শুনেছে এবং কথা বলার অভ্যাস রপ্ত করতে শুরু করেছে তাই মূলত মাতৃভাষা । মানুষ মাতৃভাষাতেই কথা বলতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। প্রত্যেক শিশুর মাতৃভাষা শিক্ষার অধিকার জন্মগত সূত্রে পাওয়া। তার নিজের অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং ক্রমশ বৃহত্তর ক্ষেত্রে সব সময়ই তাকে ভাষার মাধ্যমে ভাব বিনিময় করতে হয়। বাংলা ভাষা তার নিজের ভাষা। যে কোনো মানুষই তার নিজের ভাষায় যতটা স্বচ্ছন্দ, অন্য ভাষাতে ততটা নয়। তাছাড়া যে কোনো নতুন বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে নিজের ভাষার মাধ্যমে তা যত সহজে বোঝা যায় অন্য ভাষার সাহায্যে তা সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা বাংলা । সমীক্ষা করে দেখা গেছে আমাদের দেশে ভাষাগত বিচারে বাংলার স্থান দ্বিতীয়। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার স্থান পঞ্চম । সুতরাং প্রারম্ভিক স্তরে বাংলা ভাষা শেখার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই ভাষাটির প্রতি গুরুত্ব উপলব্ধি করে 1999 খ্রিস্টাব্দের 17 ই নভেম্বর ইউনেস্কা (UNESCO) একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। বাংলা ভাষা শুধুমাত্র ভাব বিনিময়ের মাধ্যম নয়। বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান এই ভাষার মাধ্যমে আমরা লাভ করে থাকি। বাংলা ভাষা এক সমৃদ্ধশালী ভাষা। এই সমৃদ্ধশালী ভাষার গৌরবময় ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিশ্বের দরবারে বিশিষ্ট স্থান অধিকারী করেছে । প্রতিটি শিক্ষককে শিশুর মানসিক গঠন, তাদের সহজ প্রবৃত্তি ইত্যাদি ভালো ভাবে বুঝে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান করা উচিত । এ ব্যাপারে যে সমস্ত শিক্ষা পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন সেইগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করা উচিত।

উদ্দেশ্য ঃ

* শিশুদের আত্মপ্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হলো মাতৃভাষা । তাই মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ভাষা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ।
* মাতৃভাষা শিশুদের মানসিক, নৈতিক, আবেগমূলক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে ।
* পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে সাহায্য করে ।
* ভাষার মাধ্যমে বহু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়। মাতৃভাষা, অন্য ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করে ।
* যে ভাষায় কথা বলা হয় সেই ভাষাকে জানা ও শেখা বিশেষ প্রয়োজন ।
* নিজের মাতৃভাষা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে ।
* সর্বভারতীয় তথা বিশ্ব জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় নিজের ভাষার অবদান অনস্বীকার্য ।
* মাতৃভাষা প্রতিটি শিশুর মধ্যে পঠনের অভ্যাস গড়ে তোলে ।
* মাতৃভাষা সামাজিক ও আত্মিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে ।
* মাতৃভাষা প্রতিটি শিশুর মধ্যে উন্নত রুচিবোধ ও নান্দনিক সৌন্দর্য গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।

ভাষা ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম ঃ

মানুষের ভাব বিনিময়, মতের আদান প্রদান সব কিছুই ভাষার দ্বারা সম্ভব । অর্থাৎ আমাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের সর্বপ্রধান মাধ্যমই হলো ভাষা । ভাষা সৃষ্টির আগের অবস্থায় মানুষ নানারকম ধ্বনির সাহায্যে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করতো । ক্রমে ক্রমে এই ধ্বনিগুলি পরিবর্তিত হলো শব্দে। এই শব্দগুলির অর্থ মানুষ পরস্পরকে বোঝাবার চেষ্টা করতো। এইভাবে অর্থবোধক শব্দগুলি জুড়ে জুড়ে তারা বাক্য তৈরি করতে সফল হলো । সুতরাং ভাষা আমরা তাকেই বলতে পারি যা মানুষের উচ্চারিত, বহুজনের বোধগম্য, অর্থবোধক বাক্য (শব্দ সমষ্টি), যার মাধ্যমে অপরের কাছে মনের ভাব প্রকাশিত হয়।

জ্ঞান আহরণের প্রধান হিসাবে ভাষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান এই ভাষার দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব। বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, ভাষা বৈচিত্র্যময় । এই ভাষার শিক্ষা শিশুকে প্রথম থেকেই দেওয়া প্রয়োজন। ভাষার শিক্ষা তার পঠন-পাঠনের কাজকে প্রাথমিক স্তর থেকে আরও সুন্দর ও সুষ্ঠ করে তোলে । ক্রমে শিশু বড় হতে থাকে এবং বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়ার ফলে, তার ভাষা শিক্ষার জ্ঞান আরও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলে।

বাংলা ভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে নিজের মতামত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন করা । এর ফলে যে আত্মবিশ্বাস লাভ করা যায়, তা মানুষকে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। বাংলা ভাষা শিক্ষার ফলে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য রক্ষিত হয়। তার বংশ পরম্পরাগত ঐতিহ্য, ধর্মগ্রন্থাদির বিষয়বস্তু, প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদি নিজস্ব ভাষার মাধ্যমেই জানা এবং শেখা সম্ভব । সুতরাং এই ভাষা আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক । মানব শিশুর জ্ঞানার্জনের প্রথম অবস্থা থেকেই নিজের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা, তাকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন।

এইভাবে শিশু নিজের ভাষার মাধ্যমে নিজের চারপাশের সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয় । পরে ক্রমশ বড় হতে থাকার ফলে নিজের দেশ তথা বহির্জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে।

ভাষা শিশুর জন্মজাত প্রবৃত্তি ঃ

প্রত্যেক শিশুর ভাষা শেখার প্রবণতা জন্মগত । জন্মের পরেই স্বাভাবিক ভাবে সে তার নিজের চারপাশের সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শোনার ক্ষমতা বাড়তে থাকে। যে কোন শব্দ তাকে আকৃষ্ট করে এবং শব্দের প্রত্যুত্তরে ভয়, বিস্ময়, আনন্দ ইত্যাদি অনুভূতিগুলির প্রকাশ শিশু তার সাধ্য অনুযায়ী করে থাকে। এই ভাব প্রকাশের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে শিশুর সঠিক শোনবার ও বলবার সামর্থ্য বাড়তে থাকে । মায়ের মুখের ঘুম পাড়ানি গান, বাবা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের আদরের ভাষা শিশু শোনে, হয়তো নিজের মতো করে কিছুটা বুঝতেও পারে। এরপর সে কিছু বলার চেষ্টা করে। অপরের বলা কিছু শব্দ, কিছু কথা তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করার কারণে সে সেই কথাগুলিই বলতে চায়। ধীরে ধীরে শিশু কথা বলতে শেখে । শিশুর মুখের ভাষা প্রথমে থাকে অর্থহীন । সে তার নিজস্ব ভঙ্গীতে যে ভাষায় কথা বলে, তা অপরের কাছে দুর্বোধ্য । কিন্তু ক্রমশ তার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশ ঘটতে থাকে এবং শিশু সঠিক ভাবে নিজের ভাষার প্রয়োগ করতে পারে। ভাষা জানার পর শিশু পড়তে শেখে। কোন জিনিস প্রত্যক্ষভাবে সামনে থেকে না দেখেও তার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে ।

বাংলা ভাষাকে জানা ও শেখা ঃ

শিশু প্রথমে যে ভাষায় কথা বলে, সেটাই তার মাতৃভাষা । নিজের ভাষাকে জানা এবং শেখা সব শিশুরই অধিকার এবং কর্তব্য । বাড়িতে শিশু

নিজের পরিবারের লোকজনদের কাছ থেকে নিজের ভাষা শেখে এবং জানে । পরে একটু বড় হলে আশে পাশের মানুষ অথবা বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে তার ভাষার মাধ্যমে ভাব বিনিময় হয়। এরপর সে বিদ্যালয়ে যায় । সেখানেও অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে ভাষার আদান প্রদান ঘটে। সর্বোপরি বিদ্যালয়ের শিক্ষক একটি ভাষার মাধ্যমে তাদের পড়াশোনা শেখান। নিজের ভাষার সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের সাধারণ ভাষার যদি পার্থক্য থাকে, তবে শিক্ষক বিদ্যালয়ের সাধারণ ভাষায় শিক্ষার্থীকে অভ্যস্ত করাবেন। নিজের মাতৃভাষা ভালোভাবে জানলে ও শিখলে অন্য ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও তা সাহায্য করে। বাংলা ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান হওয়ার পর ধীরে ধীরে শিশুকে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে । প্রারম্ভিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জানার কৌতুহল ও অনুকরণ জাত শেখার প্রবৃত্তি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় । তাদের জীবনের এই সময়টা হলো ভাষা শিক্ষার প্রস্তুতির কাল । তারা এই সময়ে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সহজেই মিশে যেতে পারে। ভাষার বিভিন্নতা তাদের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং অন্যান্য সঙ্গীদের কাছ থেকে নানারকম নতুন নতুন শব্দ তারা শিখে নেয়। সহজভাবে মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতাও তাদের স্বাভাবিক ভাবেই জন্মায় । যে ভাষায় সে কথা বলে, সেই ভাষাকে শুদ্ধ এবং সুন্দর রূপে শেখার উপযুক্ত সময় এই প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষার কাল। যে শিশু বিদ্যালয়ে পড়তে যায়, সে আগে থেকেই নিজের ভাষা অল্প স্বল্প শিখে আসে। শিক্ষক তাকে বর্ণমালার সাহায্যে অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন । সে বর্ণের মাধ্যমে শব্দ তৈরি করতে শেখে। শব্দের সাহায্যে বাক্য তৈরি করতে পারে । এইভাবে ধীরে ধীরে ভাষার উপর তার দখল জন্মাতে থাকে । প্রথম যে ভাষা শিশু বলতে শেখে, সেই ভাষাই তার সবচেয়ে সহজ ও সাবলীল মনে হয়। সুতরাং অপরের কাছে নিজের মনের ভাব প্রকাশের জন্য এই ভাষাই সে ব্যবহার করতে চায়। প্রারম্ভিক স্তরে শিশুদের ছড়া, রূপকথা, নীতিকথা, ছোট ছোট গল্প বলার মাধ্যমে ভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতি খুব কার্যকর হয়। চেনা পরিচিত পরিবেশের নিত্যকার ছোট ছোট ঘটনার অভিনয়, খেলাধূলা ও নানারকম আনন্দ অনুষ্ঠানের দ্বারাও শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষা দেওয়া যায়।

ভাষা শিক্ষায় মাতৃভাষা ঃ

মাতৃভাষার মধ্যে দিয়ে একটি শিশু যত সহজে মনের ভাব প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, অন্য ভাষার মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। আত্মপ্রকাশের দিক থেকেও মাতৃভাষার তুল্য আর কোন ভাষা নেই । এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেই NEP - 2020 তে মাতৃভাষায় উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেখানে Foundation এবং Preparatory - এই দুটি স্তরে মাতৃভাষার উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্গণ মনে করেন মাতৃভাষার মধ্যে দিয়ে শিশুর ভাষার বিকাশ যত সহজে সম্ভব অন্যান্য ভাষাতে তা হয় না। এর মধ্যে দিয়ে শিশু নির্দ্বিধায় মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যমে বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট উচ্চারণে দক্ষতা অর্জন, শব্দের অর্থ ও মর্ম গ্রহণ, দুর্বোধ্য বিষয় সহজে বোঝা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা, কোনো প্রশ্নের উত্তর মৌখিক ও লিখিত আকারে প্রকাশ করা, বৌদ্ধিক- মানসিক-প্রক্ষোভিক-সৃজনশীল-চিন্তাশীল চরিত্রের বিকাশ, ভাষায় বিভিন্ন দক্ষতাগুলি অর্জন, গদ্য ও পদ্য রচনা, শব্দভান্ডার বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠে । নিজের সংস্কৃতির, ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক রূপে মাতৃভাষার গুরুত্ব রয়েছে তা উপলব্ধি করতে শেখে । বলা যায় শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব ।

বাংলা ভাষা শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা ঃ

শিশু যখন বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা আরম্ভ করে, তখন সে নিজের বাড়ি এবং আশেপাশের চেনা পরিবেশের প্রভাবে নিজের ভাষায় কথা বলতে শিখেই আসে। কিন্তু বিদ্যালয়ে একটি সাধারণ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা শেখানো হয়। অনেক সময়ে বিদ্যালয়ের সেই ভাষার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ভাষার কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যাল্যয় নানা জায়গা থেকে নানাধরণের শিশুরা পড়তে আসে। তাদের ভাষার সঙ্গে বিদ্যালয়ের সাধারণ ভাষার পার্থক্য তো থাকেই । তাছাড়া শিশুদের পরস্পরের ভাষার মধ্যেও নানারকম অমিল দেখা যায়।

বাংলাতে বিভিন্ন অঞ্চলে একই কথা আলাদা ভাবে বলা হয়ে থাকে। যেমন, রাঢ় অঞ্চলে - 'রাম বললো,' ঝাড়খন্ড অঞ্চলে - 'রাম বললেক', আবার পূর্ববঙ্গের - 'রাম বইলল্য' ।

বিহারের ভাষাগুলির ক্ষেত্রেও আমরা এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। এখানে মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী, প্রভৃতি ভাষা রয়েছে। দৃষ্টান্ত রূপে বলা যায়, ভোজপুরী ভাষা সর্বত্র একইরকম ভাবে ব্যবহৃত হয় না । অঞ্চল বিশেষে একই ভাষা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন, আরা-বক্সার অঞ্চলে - 'হম্ কিতাব পঢ়ব' (আমি বই পড়ব) বেতিয়া সিবান - গোপালগঞ্জ অঞ্চলে বলা হয়, 'হম কিতাব পঢ়েম', আবার ছাপরা অঞ্চলে বলা হয় 'হম কিতাব পঢ়েব'। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় একই ভোজপুরী ভাষার বিভিন্ন রূপে ব্যবহার । এইরকম বৈশিষ্ট্য অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। বিদ্যালয়ে পড়তে আসা শিশুদের মধ্যেও এই ধরনের ভাষার ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় । শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত সাধারণ ভাষার ব্যবহার শেখাবেন এবং তাদের নিজস্ব ভাষার সঙ্গে এই ভাষার যদি কোনও বৈষম্য থাকে তবে তিনি তা দূর করার চেষ্টা করবেন। সঠিক উচ্চারণ বিধি শেখাবেন । শিশুর মুখের এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ভাষাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে মিলিয়ে দিতে হবে। ভাষা শিক্ষা দেওয়ার সেই পদ্ধতি যদি জটিল হয় তবে শিক্ষার্থীর পক্ষে তা গ্রহণ করার অসুবিধা দেখা দেবে। সুতরাং শিক্ষক তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে সহজ প্রক্রিয়ায় এ বিষয়ে শিক্ষা দেবেন । সহানুভূতির সাহায্যে শিশুদের ভাষা বুঝে প্রকৃত শিক্ষার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব শিক্ষকেরই ।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিশ্বদর্শন ঃ

শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাভাষা যে শিশুর মাতৃভাষা, তাকে শিক্ষার শুরু থেকেই এই ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে । কারণ ভবিষ্যতে সে এই ভাষাকে আশ্রয় করেই আরও বড় ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যাবে। বাংলা ভাষা অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য সহায়তা করবে। নিজের ভাষা তাকে চিন্তাশীল করে তুলবে । বাংলা শেখার পর শিক্ষার্থী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে পরিচিত হবে। বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন সাহিত্যিক তত্ত্ব ও তথ্যের মূল্যায়ন করায় সে সক্ষম হবে, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যরসের উপলব্ধিতে নির্মল আনন্দ লাভ করবে । নিজের ভাষার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করবে।

জ্ঞান আহরণের প্রধান মাধ্যম ভাষা । যুগ যুগ ধরে ভাষাই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাকে সঞ্চারিত করে দেয় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে শিশুর মনে নিজের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা । যে কোন বিষয় বিশেষরূপে অধ্যয়ন করার জন্য প্রথমে নিজস্ব ভাষার সাহায্য প্রয়োজন । বাংলা ভাষার যে সমৃদ্ধ সম্ভার রয়েছে, প্রত্যেক শিশুরই তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে। নিজের ভাষা মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রতি আস্থা তাকে জীবনের চলার পথে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সফল নাগরিক রূপে পরিচিতি দেয়। নিজের ভাষা-সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার পর শিক্ষার্থী বিশ্ব সাহিত্যের মাধ্যমে জগতকে চেনার চেষ্টা করে। নানা দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ না করলে শিক্ষা এবং জ্ঞান পূর্ণতা পায় না। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একজন নাগরিক হিসাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন ।

বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের নানারকম আরও খবর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাও শিক্ষার্থীর জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় । আজকাল শুধুমাত্র নিজের দেশ নয়, সম্পূর্ণ বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা জীবনের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে । ইন্টারনেটের কল্যাণে সমগ্র বিশ্ব আজ শিক্ষার্থীর হাতের মুঠোয় বন্দী । বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে বিপ্লব এসেছে, শিক্ষার্থীরা তারও অংশীদার। নিজের দেশের সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক বা রাজনীতিগত পরিস্থিতির সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনামূলক সমীক্ষা ইত্যাদির প্রয়োজন বর্তমান সময়ে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার হয়ে থাকে, শিক্ষক সেগুলি সম্পর্কে নিজেও শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে পারেন।

বিশ্বকে জানার জন্য শিক্ষার্থীকে নিজের ভাষার পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কারণ এই ভাষা তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে । আমাদের শিশুরা বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং ভবিষ্যতে বৃহত্তর প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হতে পারবে। উদার দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার বুদ্ধির বিকাশ তাকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য এনে দেবে। নিজের ভাষার শিক্ষার বুনিয়াদ দৃঢ় হলে আত্মনির্ভরশীল শিক্ষার্থীর বিশ্বদর্শনও পূর্ণতা লাভ করবে ।

ত্রিভাষা ও বহুভাষিকতা ঃ

ত্রিভাষার ধারণা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। 1968 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে ত্রিভাষার সংক্ষিপ্ত রূপ হল—

প্রথম ভাষা ঃ বিদ্যালয়ে প্রথমে যে ভাষায় পড়ানো হয়, তা প্রথম ভাষা। অর্থাৎ মাতৃভাষা এবং স্থানীয় ভাষা।

দ্বিতীয় ভাষা ঃ হিন্দি-ভাষী রাজ্যে দ্বিতীয় ভাষা হল, সংশ্লিষ্ট ভাষাটি ছাড়া অন্য যে কোনো ভাষা।

তৃতীয় ভাষা ঃ হিন্দি ভাষী রাজ্যে তৃতীয় ভাষারূপে ইংরেজিও ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ সেই রাজ্যে এক ভারতীয় আধুনিক ভাষা যা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে পড়ানো হয় না ।

যেমন - দক্ষিণ ভারতে প্রথম ভাষা তাদের স্থানীয় ভাষা তামিল, তেলুগু ইত্যাদি । দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি এবং তৃতীয় ভাষা বাংলা, হিন্দিও হতে পারে।

নতুন শিক্ষানীতি 2020 তে মাতৃভাষা ও স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা দানের উপর যেমন জোর দেওয়া হয়েছে, তেমনি ত্রিভাষা থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে বহুভাষার (Multilingual) কথা বলা হয়েছে। একজন ব্যক্তি দুই বা তার বেশি ভাষায় কথা বলতে ও বুঝতে সক্ষম হলে সেই ঘটনাকে বহুভাষিকতা বলে এবং ঐ ব্যক্তিটিকে বহুভাষী বলা হয়। বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষ বহুভাষী। বিশ্বায়ণ আর বৈশ্বয়িক সংস্কৃতির প্রয়োজনে বহুভাষিকতা ক্রমেই একটি সামাজিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে মানুষ এবং শিক্ষক যত বেশি ভাষা জানবে সমাজের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। স্বাভাবিকভাবে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক যদি স্থানীয় ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় শিশুদের শিক্ষা প্রদান করেন, তাহলে শিক্ষণ মনোগ্রাহী হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের দেশ বহু ভাষাভাষীর দেশ। তাই কম শ্রেণিকক্ষকেও বহুভাষিক করতে হবে। সমগ্র বিশ্বে 5000 ভাষায় মানুষ কথা বলে। ভারতে 1600 টি ভাষায় কথা বলা হয়। ভারতের সংবিধানের অষ্টম অনুসূচিতে 22টি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে বাংলা ভাষারও স্থান গুরুত্বপূর্ণ। বিহারের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষার বিবিধতা বহুল প্রচলিত।

2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী সমগ্র ভারতবর্ষের 57.1% মানুষ হিন্দি ভাষায় কথা বলে। এর পরই যে ভাষার স্থান সেটি হল বাংলা ভাষা, যা দেশের জনসংখ্যার 8.9% । বিহার রাজ্যের জনসংখ্যার 0.78 % (Census 2011) মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে।

বিহারের প্রতিটি জেলাতেই বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষ বসবাস করে। তারা যেমন চলিত মান্য বাংলা অর্থাৎ রাঢ়ী উপভাষায় কথা বলে তেমনি অঞ্চল বিশেযে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষার বহু প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যেমন - বরেন্দ্রী, ঝাড়খন্ডী,কামরূপী প্রভৃতি। তাই শিক্ষকদের স্থানীয় ভাষা ও বহু ভাষার ধারণা সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে। নতুন শিক্ষা নীতি অনুসারে বহুভাষিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যার ফলে আগামী দিনে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রক্রিয়া সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠবে ।

প্রারম্ভিক স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

* মা শিশুকে যত সহজে শিক্ষা দিতে পারে, কোন শিক্ষকের পক্ষেই তাকে তত সহজে শেখানো সম্ভব নয় । শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ মায়ের মতই মাতৃভাষার দ্বারা সম্ভব হয়ে থাকে ।

* শৈশবে যেমন মাতৃদুগ্ধ ছাড়া শিশুর বিকাশ সার্থক হয় না, তেমনি শিশুর মাতৃভাষায় শিক্ষা না হলে সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায় ।
* শিক্ষকের কাছে শোনা শিক্ষা বা কোন লিখিত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর মনে সচেতনতা তৈরি করে ।
* কিছু জানতে হলে ধৈর্যের বিশেষ প্রয়োজন হয়। সুতরাং ভাষা শিক্ষায় মনোযোগ তাদের ধৈর্যের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে ।
* শিক্ষার্থীর কথা বলার সময় যদি কোনরকম দোষ ত্রুটি থাকে, তবে শিক্ষক এই স্তরেই সেই ভুলভ্রান্তির সংশোধন করে দিতে পারেন।
* শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের আকর্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন । পাঠ্যপুস্তকের আকর্ষক ছবি এবং ছড়া, গল্প ইত্যাদি তাদের আকর্ষণ করে বেশি। সেই অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক নির্মাণ করা উচিত । তাছাড়া শিক্ষকের পড়ানোর আকর্ষক ভঙ্গি শিক্ষার্থীর জন্য উপযোগী ।
* ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার ভূমিকা অপরিসীম। সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, আমাদের মাতৃভাষাই তাকে যুগান্তরের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে । বাংলা ভাষা আমাদের মানব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদান ।
* মাতৃভাষাই সামঞ্জস্য সাধনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। জন্মের পর থেকে প্রায় সারাজীবনই নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে মানুষকে চলতে হয়। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে এই প্রতিকূলতাকে দূর করতে হয় এবং এই কাজে সহায়তা করে আমাদের ভাষা ।
* বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ফলে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে ও ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মাতৃভাষার অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর সব রকম বিকাশ অব্যাহত ও সাবলীল থাকে ।
* অন্য কোন ভাষা বা ভাবকে গ্রহণ করার সবচেয়ে তৃপ্তিকর ও সহজতম মাধ্যম হলো মাতৃভাষা । এই ভাষায় যত সহজে আমরা আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়কে জানতে, শিখতে ও বোঝাতে পারি অন্য ভাষার মাধ্যমে তা হয় না ।

সারাংশ ঃ

বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষার সঙ্গে যোগ জন্মলগ্ন থেকেই। তার অন্তরের আনন্দ - বেদনার প্রকাশ মাতৃভাষাতেই সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে সম্ভব হয়। এই ভাষা সমাজ জীবনের ভাষা, ব্যক্তিজীবনের ভাষা, মনন ও চিন্তনের ভাষা। নিজেকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে ভাষাই সাহায্য করে। মানুষের সারা জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ভাষার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য সম্পদ আমাদের গৌরবের বিষয়। মহাকাব্য, বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ ইত্যাদি সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়ে বাংলা ভাষার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এই ভাষা আত্মপ্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। সামাজিক ও মানবিক সম্পর্কের বন্ধনকে এই ভাষাই সুদৃঢ় করে। সুতরাং বাংলা ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

শিশুকে প্রাথমিক স্তর থেকে বাংলা ভাষা শেখাতে হবে। যে ভাষায় সে কথা বলতে শিখেছে সেই ভাষাকে জানা এবং শিক্ষার অধিকার, তার জন্মজাত। বাড়িতে শিশু যে ভাষায় কথা বলে অনেক সময়ই তার সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভাষার পার্থক্য থেকে যায়। এই দুই ভাষার মধ্যে যে ভিন্নতা তা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সাহায্যে দূর হয়ে যায়। বিদ্যালয়ের সাধারণ ভাষা শেখার পর ধীরে ধীরে সে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। তারপর জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশ সম্পর্কে এবং বহির্জগৎ বিষয়ক নানা রকম জ্ঞান অর্জন করতে সে আগ্রহী হয়ে ওঠে। নিজের ভাষার জ্ঞান থাকলে মানুষের বিশ্বের যাবতীয় ভাষার জ্ঞান অর্জন সহজ হয়ে পড়ে । এই ভাষার মাধ্যমে বিশ্ব দর্শন করা যায়। মানুষের চিন্তা ও ভাষার সংগতি সাধন তার নিজের ভাষাতেই সম্ভব ।

অনুশীলনী

1. প্রাথমিক স্তরে বাংলা ভাষা শেখার উদ্দেশ্য কী ?
2. ভাষা শিশুর জন্মজাত প্রবৃত্তি - আলোচনা করো ।
3. মানুষের ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম ভাষা - ব্যাখ্যা করো ।
4. বিদ্যালয়ের সাধারণ ভাষার সঙ্গে শিশুর মুখের ভাষার সামঞ্জস্য বিধান, শিক্ষক কীভাবে করবেন ?
5. যে ভাষায় শিশু কথা বলে, সেই ভাষাকে জানা ও শেখার উপকারিতা কী ?
6. বাংলা ভাষা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক - বুঝিয়ে লেখো ।
7. বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিশু বিশ্বদর্শন করবে - একথা কেন বলা হয়েছে ?
8. প্রারম্ভিক স্তরে মাতৃভাষা রূপে বাংলা ভাষার শিক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, বুঝিয়ে দাও ।
9. শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে মাতৃভাষার ভূমিকা - এ সম্পর্কে আলোচনা করো ।
10. **টীকা লেখো ঃ**

    (A) ত্রিভাষা

    (B) বহুভাষিকতা

    (C) মাতৃভাষার গুরুত্ব

    (D) বাংলা ভাষা শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা

একক - 2

বাংলা ভাষা ও লিপির উৎস এবং গঠন প্রণালী

* ভূমিকা
* উদ্দেশ্য
* বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ
* বাংলা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ
* বাংলা ভাষার গঠন ও স্বরূপ
* সারাংশ
* অনুশীলনী

‘মোদের গরব মোদের আশা
আ-মরি বাংলা ভাষা’

— অতুলপ্রসাদ সেন

একক - 2

বাংলা ভাষা ও লিপির উৎস এবং গঠন প্রণালী

ভূমিকা ঃ

বাংলা ভাষার পথ চলা দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীর ‘চর্যাপদ’ থেকে। আজও বঙ্গে, বর্হিবঙ্গে, দেশে ও বিদেশে বাংলা ভাষা সমাদৃত। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ভাষা বাংলা। তেমনি ভারত ভূখণ্ডের অন্যান্য রাজ্যেও বাংলা ভাষার প্রচলন রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা । বিহার, আসাম (বরাক উপত্যকা), ত্রিপুরা, মিজোরাম, ওড়িষ্যা, আন্দামান, উত্তর প্রদেশ, দিল্লিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। সেখানকার বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ বর্তমান। কেন্দ্রের ভারতীয় ভাষা সংস্থান কেন্দ্রের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা ভুবনেশ্বরে স্বতন্ত্র ‘বাংলা ভাষা’ বিভাগ বর্তমান। ভারতের বাইরেও আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্থানের করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ রয়েছে এবং জার্মানির সাউথ এশিয়া ইন্সটিটিউট - হিডেলবার্গ ইউনিভাসিটিতে আধুনিক দক্ষিণ এশিয়ান ভাষা হিসেবে বাংলা,হিন্দি,তামিল ও উর্দু ভাষা পড়ানো হয়। যা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে গর্বের বিষয়। ভারতের জনসংখ্যার নিরিখে সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা হিন্দি, দ্বিতীয় স্থানে বাংলা এবং বিশ্বে বাংলার স্থান পঞ্চম। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় বাংলা, ভাষার ভিত্তিতেই ‘UNESCO’ এর উদ্যোগে 1999 সাল থেকে 21 শে ফ্রেবুয়ারি সমগ্র বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে স্বীকৃতি পায়।

উদ্দেশ্য ঃ

* ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানবে ।
* বাংলা লিপি ও ভাষার উদ্ভবের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত সাধন ।
* বাংলা ভাষার গঠন এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে জানবে ।
* বাংলা ভাষার রচনাগত বিশেষত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ।
* বাংলা ভাষা ও উপভাষার সঙ্গে তুলনামূলক বিচার সম্পর্কিত ধারণা লাভ ।
* বাংলা ব্যাকরণের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হবে ।

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঃ

ভাষার শুরু আছে শেষ নেই। ভাষা আজও ভিন্ন ভিন্ন রূপময়তার আলোতে আলোকিত । সুকুমার সেন বলেছেন- “মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা” এবং “ভাষার কাজে বিশেষ একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টি-ব্যবহারকারী জনমণ্ডলীকে বলে ভাষা সম্প্রদায়।”

বাংলা ভাষার আদি মূল হল, ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্যভাষা। একথা সবার জানা। কিন্তু এর নেপথ্য যাওয়া আজ গবেষণার গূঢ়তম বিষয়। সে বিষয়ের উদ্ধার আজও হয়নি। বাংলা ভাষার উৎস সন্ধান করতে অগ্রসর হতে হলে ইন্দো ইউরোপীয়-ভাষাবংশ থেকেই শুরু করতে হবে। পাঠকদের জিজ্ঞাসা শুরু হবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের সূত্র ধরেই। এই ভাষাবংশকে আর্য ভাষা বংশও বলা হয় । ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের একটি বিশেষ শাখা ইন্দো-ইরানীয় । সেই ধারা থেকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকরা সেই মতই পোষণ করেন। নিম্নে একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হল —

ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্যভাষা

↓

ইন্দো ইরানীয়

↓

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা

↓

কথ্য সংস্কৃত

↓

প্রাচ্য

প্রাচ্যা

↓

মাগধী প্রাকৃত

↓

মাগধী অপভ্রংশ

↓

মাগধী অবহট্ট

↓ পূর্বী → বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়া

↓ পশ্চিমা → মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী

ভারতীয় আর্য ভাষার ক্রম বিবর্তন ঃ

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (Old Indo-Aryan)

বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত এবং ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অন্তর্গত। এই ভাষার কালসীমা আনুমানিক খ্রি. পূ. 1500 থেকে 600 খ্রি. পূর্বাব্দ। বেদ, পাণিনির ব্যাকরণ এই সময়ের সাহিত্যিক নিদর্শন ।

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা (Middle Indo-Aryan)

লৌকিক সংস্কৃত থেকে বিভিন্ন প্রাকৃত ও পালি ভাষার উদ্‌ভব হয়। ভাষার বিবর্তনের এই স্তরকে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা বলে। কালসীমা আনুমানিক 600 খ্রি. পূর্বাব্দ থেকে 900 খ্রিস্টাব্দ ।অশোকের অনুশাসন, সুতনুকা প্রত্নলেখ, খারবেল অনুশাসন এই সময়ের সাহিত্যিক নিদর্শন।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা (New Indo-Aryan)

এই স্তরে হিন্দি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, মারাঠি, বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া ইত্যাদি উত্তর ও পূর্ব ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলির উদ্‌ভব ঘটে। কালসীমা আনুমানিক 900 খ্রিস্টাব্দ থেকে সম্প্রতিক কাল। প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদ।

ভাষা হল সাহিত্যের শরীর। সাহিত্যকে পূর্ণতা দান করে ভাষা। ভাষাই সাহিত্যকে পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। ভাষার গঠন-প্রকৃতি কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তার উপর নির্ভর করে রচনার মান। ভাষা পরিবর্তনশীল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা নিত্য-নতুন সাজে

সজ্জিত হতে থাকে ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে। ভাষার উপাদানগুলির অন্তর-রহস্য রচনাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলে। ভাষা বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। একথা প্রমাণিত যে, উনিশ শতকের সাহিত্যের ভাষার যে কাঠিন্য তা আজ সরলীকৃত। বলা বাহুল্য, হয়তো পাঠকের প্রয়োজনেই। নবম-দশম শতাব্দীতে চর্যাপদের সৃষ্টি হয়। আজ একবিংশ শতাব্দীর দুই দশক অতিক্রান্ত। এই আদি ও বর্তমানের মধ্যসময়ে ভাষার অভাবনীয় বিপ্লব ঘটেছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা আজও ভাষাকেন্দ্রিক গবেষণায় আগ্রহ পোষণ করছেন ।এই হাজার বছরে বাংলা ভাষা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা এই হাজার বছরের বিবর্তনের ইতিহাসকে প্রধান তিনটি স্তরে বা যুগে বিভক্ত করেছেন—

1. প্রাচীন বা আদি বাংলা (কালসীমা 950 - 1350 খ্রিঃ)
2. মধ্য বাংলা - আদি -মধ্য বাংলা (1351 -1500 খ্রিঃ) এবং
   অন্ত্যমধ্য বাংলা (1501-1760 খ্রিঃ বা মতান্তরে 1799 খ্রিঃ)
3. আধুনিক বাংলা (কালসীমা 1761 খ্রিঃ বা মতান্তরে 1800 খ্রিঃ থেকে আজ পর্যন্ত)

চর্যাপদের 'সন্ধ্যা' ভাষা থেকে বাংলার পথ চলা শুরু। চর্যাপদের আদি কবি লুই পাদের প্রথম পদ, ''কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল। চঞ্চল চীত্র পইঠো কাল ।'' আজ সাহিত্য রচনা হচ্ছে শিষ্ট চলিত ভাষায় । নানা উপভাষাতেও সাহিত্য রচনার নিদর্শন এখন প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে। আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আসলে পদ্য সাহিত্যের ইতিহাস। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের কিছু কিছু অংশ ছাড়া সাহিত্যে গদ্য ভাষা তেমন ভাবে পাওয়া যায় না।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনের সূত্র ধরে গদ্য সাহিত্যের সূচনা। সেই সময় বহু ব্যাকরণ গ্রন্থ রচিত হয় যা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নতুন দিশার সন্ধান দেয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকগণের দ্বারা বাংলা গদ্যসাহিত্যের পথ চলা শুরু। তার মধ্যে উইলিয়াম কেরী ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্য ভাষায় কথ্যরীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন — ''যে বছরে শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড়ো দুঃখে দিন কাটে। কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাকপাত, শামুক গুগলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি'' । (প্রবোধচন্দ্রিকা)

রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রাবন্ধিকগণ গদ্য সাহিত্যের জয়যাত্রাকে অগ্রসর করলেন এবং বাংলা গদ্য সাহিত্য ক্রমশ বয়ঃপ্রাপ্ত হতে শুরু করলো। বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে উনিশ শতকের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার অবদানও যথেষ্ট। এছাড়াও 1817 সালে 'স্কুল বুক সোসাইটি' এবং 1851 সালে 'ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানও বাংলা গদ্যসাহিত্যের গতি প্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

কথ্যরীতির গদ্যই বাংলা চলিত গদ্যের জন্ম দিয়েছে। এই ধারায় দুইজন ব্যক্তির নাম অবশ্যই উল্লেখ্য । তাঁরা হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁদের বিখ্যাত দুটি রচনা হল-যথাক্রমে 'আলালের ঘরে দুলাল' (1858) ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (1862)। গদ্যসাহিত্যের সূচনার অর্ধ শতাব্দী পরে সাহিত্যে ভাষা প্রয়োগে পরিবর্তন আসে তাঁদের কলম ধরে। প্যারীচাঁদ মিত্রের গদ্যরীতি 'আলালী রীতি' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যরীতি 'হুতোমি ভাষা রীতি' নামে পরিচিত । একটি করে নিদর্শন নিম্ন দেওয়া হল —

''বাবুরাম বাবু চৌ গোপ্পা-নাকে তিলক-কস্তাপেড়ে ধুতি পরা,ফুলপুকুরে জুতা পায়-উদরটি গণেশের মত-কোঁচান চাদরখানি কাধে-এক গলা পান-ইতস্তত বেড়াইয়া চাকরকে বলেছেন- 'হরে হরে, শীঘ্র বালী যাইতে হইবে, দুই চার পয়সার একখানি চলতি পাল্কী ভাড়া করত।'' (আলালের ঘরে দুলাল)

"কলকেতায় প্রথম বিধবা বিবাহের দিন বালি, উত্তরপাড়া, অম্বিকে ও রাজপুর অঞ্চলের বিস্তর ভট্‌চায্যিরা সভাস্থ ফলার বিদেয় মারেন, তারপর ক্রমে গা ঢাকা হতে আরম্ভ হন, অনেকে গোবর খান, অনেকে সভাস্থ হয়ে বলেন, আমি সেদিন শয্যাগত ছিলাম।" (হুতোম প্যাঁচার নকসা)

'আলালী রীতি' ও 'হুতোম রীতি'র পরই গদ্যসাহিত্যের সার্থক স্বরূপ, উপন্যাসের সফল ও সার্থক সৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনির সূত্রে। উপন্যাস শিল্পের প্রকরগত বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ভাষা। ভাষার শৈল্পিকতা উপন্যাসের বাকি উপাদানগুলিকে সজীব করে তোলে। উপন্যাসের নির্মাণ কৌশলের যে কাঠামো তা ভাষার উপরই নির্ভরশীল।বাংলা সাহিত্যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনই প্রথম জানিয়েছিলেন যে, ভাষাকে শিল্প হিসাবে তৈরি করতে গেলে তাকে শুধু অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, তার মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে ধ্বনিসৌন্দর্য। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রও এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে ভাষা একটি অন্যতম উপাদান। বাংলা সাহিত্যে এই ভাষা নতুন ভাষা, যার মধ্যে গন্ধ, ধ্বনি, রঙ সবকিছুই ভরা । 1914 সালে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজ পত্র' প্রকাশিত হওয়ার পরেই রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত ভাষা পরবর্তীকালে 'রাবীন্দ্রিক ভাষা' হিসাবে পরিচিত হয়। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের সাধু ভাষায় লেখা শেষ উপন্যাস 'চতুরঙ্গ'। তারপর তিনিও যুগের প্রয়োজনে চলিত গদ্যে প্রথম উপন্যাস রচনা করলেন 'ঘরে বাইরে'। আরেকজন প্রাবন্ধিক চলিত গদ্যের ব্যবহারের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ । প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, 1965 খ্রিষ্টাব্দের 22 মার্চ থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা চলিত ভাষায় সংবাদ পরিবেশন আরম্ভ করে। কিন্তু আজও সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে সাধু ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের লেখকগণ বর্তমানে ভাষাকে আলাদা ধাঁচে ব্যবহার করছেন। নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন এবং সাফল্যও আদায় করেছেন বর্তমান পাঠকের কাছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, অমিয়ভূষণ মজুমদার, কমলকুমার মজুমদার, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সৈকত রক্ষিত প্রমুখ। কিস্‌সা সিরিজের স্রষ্টা ঔপন্যাসিক আফসার আমেদও তাঁদের মধ্যে একজন। বস্তুত ঔপন্যাসিক তাঁর রচনায় ভাষার কারিগর। মহৎ শিল্পীরা নিজের ক্ষমতায় তাঁদের নিজস্ব একটা ভাষা-শৈলী নিজেরাই গড়ে তোলেন।

প্রাচীন বাংলা ভাষা ঃ

এই পর্বের সময়সীমা আনুমানিক 950 থেকে 1350 খ্রিস্টাব্দ । কিন্তু তুর্কি আক্রমণজাত কারণে 950 থেকে 1200 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন কালের সময়সীমা ধরা হয়। কারণ 1201- 1350 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোনও সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এটি সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলে পরিচিত বা চিহ্নিত। এই পর্বের বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধ সহজিয়াদের রচিত 'চর্যাপদ'-এ। এছাড়া আর যে সব রচনা থেকে এই পর্বের বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা হল-বৌদ্ধকবি ধর্মদাসের 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডল' , সর্বানন্দ রচিত 'অমরকোষ' টীকাসর্বস্ব। এ ছাড়া 'সেক শুভোদয়া'র উদ্ধৃত গান ও ছড়ায়। এই যুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য হল—

* পদের শেষে অবস্থিত স্বরধ্বনি বজায় ছিল। যেমন— উত্থিত > উট্‌ঠিঅ ইত্যাদি ।
* প্রাচীন বাংলা ভাষার স্বরসঙ্গতি ও সমীভবনের ধারা দেখা যায়। যেমন — স্বরসঙ্গতি ঃ দৃঢ় > দিঢ়ি, সমীভবনঃ নিশ্চল > নিচ্চল প্রভৃতি।
* যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণ দেখা যায় । যেমন — জন্ম > জাম ইত্যাদি ।
* নাসিক্য ব্যঞ্জন অনেক স্থানে লুপ্ত হয়েছে। ফলে পরবর্তী স্বরধ্বনি আনুনাসিক হয়ে গেছে, যেমন — শব্দেন্‌ > সাঁদে, মধ্যেন > মাঁঝে ইত্যাদি ।

* পাশাপাশি দুটি স্বর বজায় ছিল। যেমন — উদাস > উআস ইত্যাদি ।
* এই পর্বে বাংলা ভাষায় পাদাকুলক ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় ।
* যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষণীয় । যেমন— দুহিল দুধু (দোয়া দুধ) ইত্যাদি।
* সংখ্যাবাচক ও বহুত্ববাচক শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয় । যেমন— পঞ্চবী (পাঁচ), সকল ইত্যাদি ।

মধ্য বাংলা ভাষা ঃ

এই পর্বের স্থিতিকাল 1351 থেকে 1760 পর্যন্ত । এই পর্বকে দুটি উপপর্বে ভাগ করা হয়েছে—

ক. **আদি-মধ্য বাংলা (1351-1500 খ্রিস্টাব্দ) ঃ** এই পর্বের বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে।

এই পর্বের ভাষার বৈশিষ্ট্য হল —

* পদের শুরুতে অবস্থিত 'অ' বিবৃত উচ্চারিত হত। যেমন— অতি > আতি ইত্যাদি ।
* মহাপ্রাণ বর্ণের প্রাচুর্য, যেমন - আহ্মি, কাহ্ন, যেহ্ন ইত্যাদি ।
* এই পর্বে প্রথম শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত দেখা যায়। যেমন — আন্ধারী (অন্ধকার)।
* স্বরসঙ্গতি ও অপিনিহিতির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যেমন— স্বর সঙ্গতি ঃ ভেড়ি > ভিড়ি ইত্যাদি । অপিনিহিত ঃ আহিই > আইস ইত্যাদি ।
* এই পর্বে অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে 'আছ' ধাতু যুক্ত হয়ে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠন করা হত। যেমন — ফুটিল + আছে > ফুটিলছে প্রভৃতি ।

খ. **অন্ত্য - মধ্য বাংলা (1501 - 1760 খ্রিস্টাব্দ) ঃ** এই পর্বের বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের অনুবাদ, জীবনী সাহিত্য ইত্যাদিতে। এই পর্বের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য হল—

* একক ব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত 'অ' কারের বিলোপ ঘটেছে। যেমন —'শ্রীদাম সুদাম্ দাম্ শুন ওরে বলরাম' ।
* 'অ' কার 'ও' কারে পরিণত হয়েছে । যেমন— ভাল > ভালো ইত্যাদি ।
* 'অ্যা' ধ্বনিটি এই পর্বেই পাওয়া গেছে। যেমন — রাখ্যাছি, গোধিক্যা প্রভৃতি ।
* বিশেষ্যকে জোর দেওয়ার প্রয়োজনে বিশেষ্যের আগে 'অ' উপসর্গ ব্যবহার করা হত। যেমন- অ + কুমারী > অকুমারী ইত্যাদি ।
* 'আছ' ধাতু যোগ করে যৌগিক কালের রূপ গঠন করা হত। সেমন— আন্ + আছ = আন্যাছি প্রভৃতি ।
* মধ্য বাংলায় ত্রিপদী পয়ার ছন্দের ব্যবহার ছিল ।

আধুনিক বাংলা ভাষা ঃ

1761 থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই পর্বের সময়সীমা । বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা অর্থাৎ গদ্য সাহিত্যের সূচনা। বাংলা

ভাষার যে রূপটির আশ্রয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলা গদ্য-গ্রন্থাদি রচনা হয়ে আসছে, সেই সাহিত্যিক রূপটির নাম সাধু ভাষা। আর বাংলা ভাষার যে রূপটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরে দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত আটপৌরে প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে, সেই মৌলিক রূপটির নাম চলিত ভাষা।

সাধু ভাষা ঃ

বাংলা গদ্যসৃষ্টির প্রথম যুগে যে সমস্ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের হাতে গদ্য সৃষ্টির ভার পড়ে, তাঁরা লৌকিক বাংলার মৌখিক রূপটির আমল দেওয়া তো দূরের কথা, লেখার মধ্যে যত বেশি পারলেন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে ভাষাকে ক্রমশঃ জটিল দুর্বোধ্য করে তুলতে লাগলেন। এরফলে নতুন সৃষ্ট বাংলা গদ্যের নাভিশ্বাস উঠতে লাগলো। এই অপমৃত্যুর হাত থেকে বাংলা গদ্যকে বাঁচালেন বঙ্কিমচন্দ্র। তৎসম শব্দের পাশাপাশি প্রয়োজন মতো তদ্ভব, দেশি, বিদেশি প্রভৃতি মৌখিক ভাষার শব্দকে স্থান দিয়ে তিনি বাংলা গদ্য ভাষার একটি শ্রীক্ষেত্র-রচনার প্রয়াস করলেন। বঙ্কিম-নির্দেশিত এই ভাষাই আদর্শ সাধু ভাষা (Standard Literary Bengali) নামে পরিচিত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র প্রমুখ শিল্পীগণ এই ভাষাতেই প্রথমদিকের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এই সাধু ভাষা সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন "সাধু ভাষা সমগ্র বঙ্গদেশের সম্পত্তি"। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যায়, বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকাতে সম্পাদক সমীপেষু অংশে এখনো সাধু ভাষার ব্যবহার হয়। এই সাহিত্যিক সাধুভাষার দুটি রূপ বর্তমানে দেখা যায়-

1. একটি তৎসম শব্দবহুল গম্ভীর আভিজাত্যপূর্ণ অথচ প্রাঞ্জল মধুর ধ্বনিমুখর রূপ।
2. অপরটি তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ইত্যাদি শব্দের পরিমিত ব্যবহারে সরল স্পষ্ট রূপ।

যেমন— "যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ- কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়- কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, চশমার হাট লাগিয়া যায়-কত কবিতা, শ্লোক, গীত হেটো ইংরেজি, মেঠো ইংরেজি, চোরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজিতে নসীবাবুর বৈঠকখানা পারাবত কাকলী সংকুল গৃহসৌধবৎ মুখরিত হইয়া উঠে।" — বঙ্কিমচন্দ্র ।

চলিত ভাষা ঃ

আদর্শ চলিত বাংলা ভাষার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল "Standard Colloquial Bengali", কলকাতা ও ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলের ভদ্র শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায়ের মার্জিত কথ্য ভাষা। এই ভাষার আদর্শ রূপটি সর্বজনবোধ্য ও সর্বমান্য সাহিত্যিক ভাষারূপে গৃহীত । চলিত ভাষা নবীনতম ভাষা। মূলত ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে চলিত ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। সাহিত্যে যার প্রয়োগ ঘটেছে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'তে (1857)। এখানেই চলিত ভাষার লিখিত রূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। অবশ্য মধ্য যুগে চলিত রীতির সামান্য উদাহরণ দেখা গেছে মুকুন্দরামের কালকেতু উপাখ্যানে ।

পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরীর রচনাতেই বাংলা চলিত ভাষার যথার্থ রূপটি ফুটে উঠেছে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক লেখক, যেমন—বুদ্ধদেব বসু, মোহিতলাল মজুমদার, বনফুল, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখের লেখাতে চলিত রীতির ব্যবহার দেখা যায়। এখন তো চলিত ভাষা বাঙালি মাত্রই লেখা এবং কথা বলার ভাষা হয়ে উঠেছে। এটি একটি সর্বজনবোধ্য সহজ সরল ভাষা। এই ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ —

* চলিত ভাষা নবীনতম ভাষা। মূলত সাধু ভাষার বহু পরে এই ভাষার জন্ম হয়েছে।
* এই ভাষায় ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত। যেমন — যাবো, খাবো, করবো, বলবো, নেবে, কিনবে ইত্যাদি।

* চলিত ভাষায় সন্ধিবদ্ধ বা সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। যেগুলি ব্যবহৃত হয়, সেগুলি সন্ধিবদ্ধ বা সমাসবদ্ধ পদ মনে হয় না ।
* এখানে সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ-তাহাদের > তাদের, উহাদের > ওদের, কাহার > কার ইত্যাদি ।
* চলিত ভাষায় তৎসম নয়, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি এবং প্রাদেশিক নানা শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন — তদ্ভব শব্দ ঃ আজ, হাত, চাঁদ, হাট ইত্যাদি। দেশি শব্দ ঃ ডাল, ঢেঁকি, ঢোল, ডোবা, ডাঙা প্রভৃতি। বিদেশি শব্দ ঃ কাগজ, দরজা, জানালা, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি ।
* বর্ণদ্বিত্বের ব্যবহার দেখা যায় এই ভাষায় । উদাহরণ - ছোট্ট, বড্ড, সক্কাল ইত্যাদি ।
* ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ চলিত ভাষায় দেখা যায়। যেমন— করছে, শেখাবেন, পৌঁছে, এসো ইত্যাদি ।
* এই ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়ার প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

  শনশন করে বাতাস বইছে।

  পতপত করে পতাকা ওড়ে ।

  গুনগুন করে ভ্রমর গান গায়।
* চলিত ভাষার অনেক শব্দে ‘হ’ ধ্বনিটি লুপ্ত । যেমন — ফলাহার > ফলার, সিপাহী > সিপাই প্রভৃতি ।
* এই ভাষায় অলংকার ব্যবহারের প্রবণতা কম দেখা যায়। যেমন— শোকের ঝড় বইল সভাতে > সভাতে ঝড়ের বেগে শোক বয়ে গেল।

বাংলা উপভাষা ঃ

একই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ নানা অঞ্চলে বাস করে। তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক কাজে উচ্চারিত মৌখিক ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত গুণাবলী নিয়ে যে স্বতন্ত্র ভাষা তৈরি হল তাই উপভাষা। মূল ভাষার সঙ্গে উপভাষার ধ্বনিগত, রূপগত ও অর্থগত পার্থক্য থাকলেও উপভাষার সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মূল কথা হল উপভাষা অঞ্চল বিশেষের মৌখিক ভাষা আর মান্য ভাষা বা মূল ভাষা সমস্ত উপভাষিক অঞ্চলের জনগণের যোগাযোগকারী ভাষা। তাই প্রত্যেকটি উপভাষা ব্যবহারকারী জনগণকে মূল ভাষার সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত হতে হয়। বাড়িতে বা নিজের পাড়ায় উপভাষার উচ্চারণ, শব্দ ব্যবহার ও বিদ্যালয়ে মূল ভাষার সঙ্গে পরিচিতি সাধন - এই দুইয়ের মাঝে শিক্ষার্থীরা ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। যেহেতু উপভাষা অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত, তাই একে আঞ্চলিক ভাষাও বলা হয়। বাংলায় পাঁচটি উপভাষা আছে—

1. **রাঢ়ী উপভাষা ঃ** ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী অঞ্চলের অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চলের মৌখিক ভাষাকে রাঢ়ী ভাষা বলা হয়। ভাগীরথী তীরবর্তী বিস্তৃর্ণ অঞ্চল, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পাটনা, ভাগলপুর জেলা এই উপভাষার অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য —

* অ কারকে ও - কার রূপে উচ্চারণ করার প্রবণতা। যেমন — অতুল > ওতুল, মধু > মোধু ইত্যাদি
* আনুনাসিক স্বরধ্বনির প্রাধান্য । যেমন — খোঁকা, হাঁতি প্রভৃতি ।
* গ্রামীণ লোকেদের উচ্চারণে পদের প্রথমে র-কারের ব্যবহার হয়, আবার র-কার লোপও হয় কখনো কখনো।

  যেমন - আশু > রাশু, রস > অস, রায় বাহাদুর > আয় বাহাদুর

* অনেক সময় 'ল'এর উচ্চারণ 'ন' হয়। যেমন, লুচি > নুচি, লেপ > নেপ ।

* বহু ক্ষেত্রে 'শ' এর উচ্চারণ 'স' হয়। যথা, আশু > আসু, শশী > সসী ইত্যাদি ।

2. **ঝাড়খণ্ডী উপভাষা ঃ** দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের ভাষাকে বলা হয় **ঝাড়খণ্ডী** । বিহারের বাঁকা, ঝাড়খন্ডের কিছু অংশ, যেমন — মানভূম, ধলভূম, সিংভূম, দক্ষিণ পশ্চিম বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দক্ষিণ পশ্চিম মেদিনীপুর অঞ্চলে ঝাড়খণ্ডী ভাষা ব্যবহৃত হয়। এই উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ–

* এই অঞ্চলের ভাষায় আনুনাসিক ধ্বনির প্রাচুর্য দেখা যায়। যেমন - চাঁ, হঁইছে ইত্যাদি

* সম্প্রদান কারকের ব্যবহারে অনুসর্গের প্রয়োগ নেই। যেমন — জল কে চল ।

* নাম ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার। যেমন - জাড়াবে ।

* 'আছ' ধাতুর জায়গায় 'বট' ধাতুর প্রয়োগ - করি বটে (করছে)

* ক্রিয়াপদে 'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার — যাবেক, করবেক, বললেক ।

3. **বরেন্দ্রী উপভাষা ঃ** উত্তর মধ্য বঙ্গের ভাষাকে **বরেন্দ্রী** বলা হয় । কাটিহার, পূর্ণিয়া, কিশনগঞ্জ, মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহি, পাবনা, বগুড়াতে বরেন্দ্রী উপভাষায় লোকে কথা বলে। বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি হলো —

* স্বরধ্বনি রাঢ়ীর মতোই । তবে কখনো কখনো 'এ' ধ্বনি অ্যা হয় - দেন > দ্যান, করে > কর‍্যা ।

* রাঢ়ীর মতো শব্দের প্রথমে 'র' কারের আগম হয়। যেমন— আশু > রাশু । 'র' কারের লোপও হয়। যথা - রস > অস ।

* গৌণক্রমে 'কে', 'ক' বিভক্তিযুক্ত হয়। যেমন — হামাক (আমাকে) দাও।

4. **বঙ্গালী উপভাষা ঃ** পূর্ব বঙ্গের (বাংলাদেশ) কথ্য ভাষাকে **বঙ্গালী** বলা হয়। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা, চকমা, উত্তর পূর্ব নদীয়া, বিহারের পূর্ব ও পশ্চিম চম্পারণ প্রভৃতি জায়গার উপভাষা এটি। এটি বর্তমান বাংলাদেশের প্রধান উপভাষা। এই অঞ্চলের ভাষার দুটি বিভাগ আছে-— পূর্ববঙ্গের উপভাষা এবং দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গের উপভাষা ।

পূর্ব বঙ্গের উপভাষা বৈশিষ্ট্য —

* ড়, ঢ় এর উচ্চারণ হয়। যেমন — বাড়ি > বারি, দৃঢ় > দৃর ।

* শ, ষ, স বর্ণগুলি 'হ' রূপে উচ্চারণ করা হয়। যেমন — শালা > হালা সে > হে ইত্যাদি ।

* পদের প্রথমের কিংবা মধ্যের হকার 'অ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন - হয় > অয়, হইবে > অইবে ।

দক্ষিণ - পূর্ববঙ্গের উপভাষার বৈশিষ্ট্য —

* এই ভাষায় 'উ' কখনও কখনও 'ও' হয়। যেমন — সুন্দর > হোন্দর ।

* আনুসাসিক ধ্বনির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যেমন - আমি > আঁই, আকাশ > আঁশ ।

* 'প' এর উচ্চারণ কখনও কখনও 'ফ' বা 'হ' হয়। যেমন — পানি > ফানি > হানি ।

5. **কামরূপী উপভাষা ঃ** পূর্ণিয়া ও কিশনগঞ্জের কিছু অংশ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দক্ষিণ দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলের কথ্যভাষা হলো **কামরূপী** উপভাষা।

কামরূপী ভাষার সঙ্গে বরেন্দ্রী ও বঙ্গালী উপভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। রাঢ়ীর সঙ্গে সাদৃশ্য সামান্য।

এই ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো —

* ‘ও’ ‘উ’ - রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, চোর > চুর, জ্যোতিষ > জুতিষ।
* শব্দের মধ্যেকার ‘অ’ থাকলে সেটি কখনও কখনও ‘আ’ হয়। যথা, অষ্ট > আষ্ট, অবস্থা > আবস্থা ইত্যাদি ।
* শব্দের মধ্যেকার ‘অ’ কখনও কখনও ‘উ’ হয়, যেমন— এমন > এমুন, বাসন > বাসুন প্রভৃতি ।
* কখনও কখনও ‘ন’ > ‘ল’ হয়। যথা, ননী > লনী, নীল > লীল, আবার কখনও ‘ল’ এর উচ্চারণ ‘ন’ হয় । লাঙ্গল > নাঙ্গল ।
* শব্দের শেষে ‘অ’ থাকলে অনেক সময় তা ‘উ’ রূপে উচ্চারিত হয় । যেমন- তুচ্ছ > তুচ্ছু, দুঃখ > দুঃখু ।

উক্ত পাঁচটি উপভাষার মধ্যে **রাঢ়ী** উপভাষাকেই চলিত মান্য হিসাবে ধরা হয়। সাহিত্য, সিনেমা বেশীরভাগ এই শিষ্ট চলিত মান্য ভাষায় রচিত হয়। বাংলার এই বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাগুলির আলোচনায় দেখা যায়, প্রত্যেকটি ভাষারই নিজস্ব কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব আছে। আবার সব অঞ্চলের ভাষাগুলির মধ্যে সাদৃশ্যও আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে । বাংলা ভাষার আঞ্চলিক ভাষাগুলির মতো বিহারেও অঞ্চল বিশেষে পৃথক পৃথক ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। বিহারের মিথিলাঞ্চলের ভাষা মৈথিলী, ছাপরা, সিবান প্রভৃতিতে ভোজপুরী ভাষা আবার পাটনা, গয়া, জাহানাবাদ অঞ্চলে মগহী ভাষায় কথা বলা হয়ে থাকে। এছাড়া বিহারে অঙ্গিকা এবং বজ্জিকাও প্রচলিত। মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রশিক্ষককে পড়াবার সময় এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই ভাষাগুলির সঙ্গে বাংলার আঞ্চলিক ভাষা তথা স্বীকৃত বাংলা ভাষার সম্বন্ধ, সাদৃশ্য এবং পার্থক্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে। তুলনামূলক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সহজ ভাবে শিক্ষার্থীদের বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে হবে, যেমন —

বাংলা - আজ খাবো না।
হিন্দী - আজ নহী খায়েঁগে ।
ভোজপুরী - আজ না খায়েব ।

বাংলা লিপির উদ্ভবও ক্রমবিকাশ ঃ

ভারতে পাওয়া প্রাচীনতম লিপির সন্ধান পাওয়া যায় অশোকের বিভিন্ন অনুশাসনে । সে দুটি ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী । লেখার ক্ষেত্রে খরোষ্ঠী লিপি সাধারণত ডান দিক থেকে শুরু করে বাঁদিকে এগিয়ে যায়। আর ব্রাহ্মী বাঁ দিক থেকে ডানদিকে। অবশ্য দুই এক জায়গায় এর ব্যতিক্রমও আছে। বর্তমান কালের আরবি, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় লেখার ক্ষেত্রে খরোষ্ঠীর প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু সংস্কৃতসহ সমস্ত নব্যভারতীয় আর্য ভাষায় ব্রাহ্মী প্রভাবই লক্ষণীয়।

অনুমান করা হয় খ্রিস্ট পূর্ব পঞ্চম থেকে তৃতীয় শতক অবধি ব্রাহ্মী লিপির যুগ। কালে কালে ওই লিপি উত্তর ও দক্ষিণ ভেদে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। দক্ষিণ থেকে তামিল, তেলেগু ইত্যাদি লিপি, আর উত্তর থেকে বাংলা ইত্যাদি লিপির উদ্ভব হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভালো অশোকের অনুশাসন ছাড়া অন্যান্য অনুশাসনের সাহায্যেও বাংলালিপির বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়। ‘মহাস্থানগড়’ লিপি এক্ষেত্রে

বিশেষ সহায়ক, কারণ এখানেও ভারতীয় লিপির বিবর্তনের ইতিহাসটি স্পষ্ট। উল্লেখ্য, এটি বঙ্গদেশের প্রাচীনতম লিপি। এটি পাওয়া গিয়ে ছিল খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতকে । এ ছাড়া কণিষ্ক ও রুদ্রদামনের লিপির সঙ্গেও ব্রাহ্মী লিপির যথেষ্ট মিল আছে। কিন্তু গুপ্তযুগ থেকে এই লিপি ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। পরে এই লিপি দুটি ধারায় ভাগ হয়ে যায় । সে দুটি পূর্বী ও পশ্চিমা ধারা । প্রথম ধারার দুটি উপধারা ছিল। সেটিও পূর্বী ও পশ্চিমা। এই পূর্বীম ধারা থেকেই সৃষ্ট সিদ্ধমাতৃকা লিপি। এটিই পরবর্তীকালে বিবর্তিত হতে হতে কুটিল লিপির উদ্ভব ঘটিয়েছে । বিশেষজ্ঞদের মতে কুটিল লিপি থেকেই বঙ্গলিপির উদ্ভব । বিষয়টি একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হল —

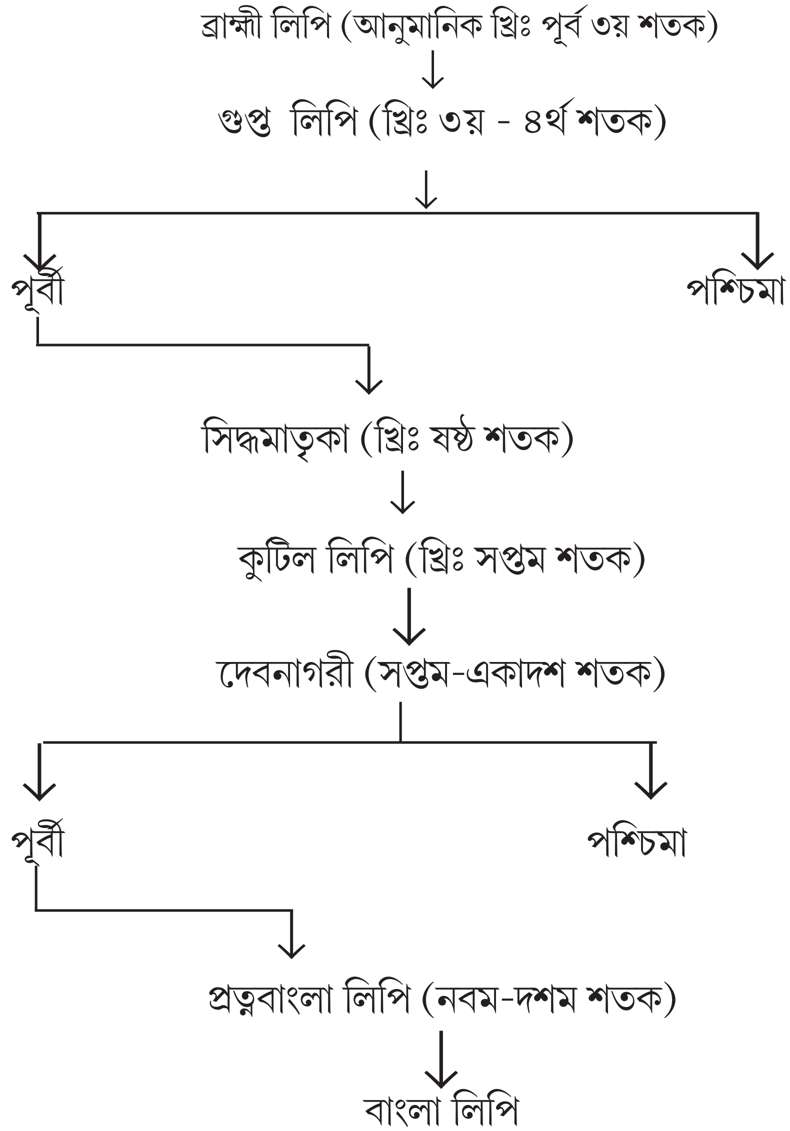

বাংলা লিপির প্রথম সামগ্রিক মুদ্রিত রূপ পাওয়া গেল হ্যালহেডের লেখা ‘A Grammar of the Bengali Language’ (1743) গন্থে। এটি ভারতবর্ষে মুদ্রিত। এর ছাঁচ তৈরি করেছিলেন পঞ্চানন কর্মকার ও মনোহর কর্মকার । মূলত বাংলা ভাষার প্রাচীন লিপির সঙ্গে কালীকুমার রায় ও খুশমৎ মুন্সির হস্তাক্ষর মিলিয়ে বাংলা ভাষার লিপিগুলি তৈরি হয়েছিল। আজ অবধি এই লিপি প্রণালীই বাংলা ভাষার আদর্শ। তবে এরই মাঝে বিদ্যাসাগর বাংলা লিপির কিছুটা সংস্কার করেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় প্রমুখ বাংলা লিপি ও মুদ্রণ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। সুকুমার রায় তো বাংলা হরফের ক্ষেত্রে কার্ন টাইপ ও যুক্ত বর্ণের আমূল সংস্কার করেছেন। অত্যাধুনিকতার যুগে বিভিন্ন ফন্ট আবিষ্কার হয়েছে, ফলে লিপিগুলি শিষ্ট মার্জিত রূপে ছাপা হচ্ছে।

বাংলা লিপির বিবর্তনক্রম ও স্বরূপ

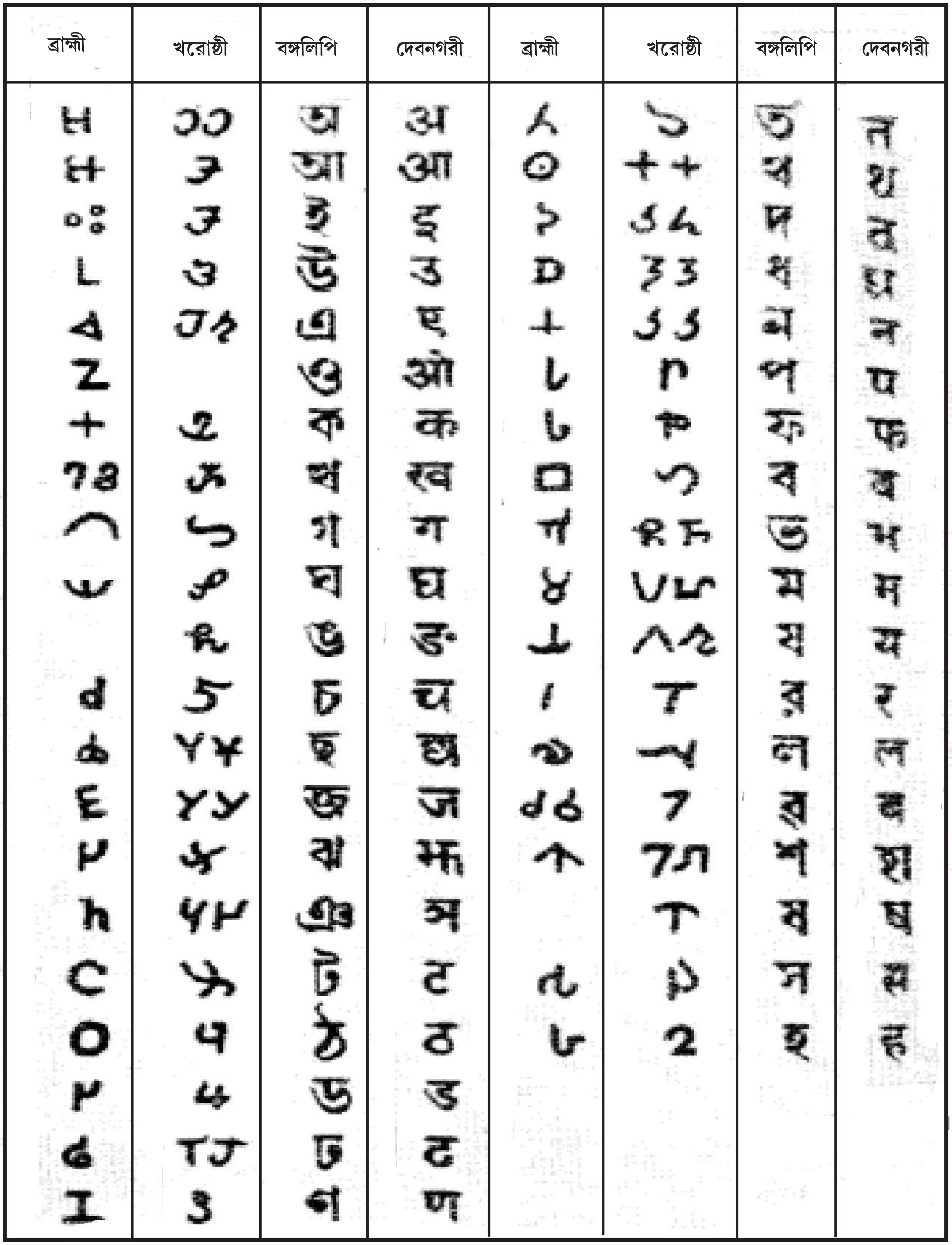

বাংলা ভাষার গঠন ও স্বরূপ ঃ

মনের বিভিন্ন ভাব-প্রকাশের জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা সম্পাদিত, বাঙালী -সমাজে প্রচলিত, প্রয়োজনমতো বাংলা বাক্যে প্রযুক্ত হবার উপযোগী শব্দসমষ্টির নাম বাংলা ভাষা। (পৃ-১ । বামনদেব) ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হল দল । সাধারণভাবে ভাষার মূল একক ধ্বনি বলে আমরা জানি। ধ্বনির লেখ্য রূপ বর্ণ । আর কতকগুলি বর্ণ মিলে অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দ বলা হয়। বিভক্তি যুক্ত শব্দ বা ধাতু, বাক্যে ব্যবহৃত হলে পদ নামে অভিহিত করা হয়। পদ প্রধানত দুই প্রকার নামপদ ও ক্রিয়াপদ —

নামপদ - বিশেষ্য (Noun), সর্বনাম (Pronoun), বিশেষণ (Adjective), অব্যয় (Conjunction),

ক্রিয়াপদ - ক্রিয়া (Verb) ।

বিশেষ্য - যে শব্দ কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, জাতি, গুণ, ধর্ম, অবস্থা, কার্য সমষ্টি ইত্যাদির নাম বোঝানো হয় তাকে বিশেষ্য পদ বলা হয়। বিশেষ করে বলা হয় বলে এর নাম বিশেষ্য। একটি শব্দের দ্বারা কোন কিছুকে বিশেষ ভাবে বোঝাতে চাইলে নাম বলা ছাড়া উপায় নেই। সুতরাং বিশেষ্য কথাটির অর্থ বলতে কোন কিছুর নাম, যেমন — রাজেন্দ্র প্রসাদ, কবি নিরালা, পাটনা, রবীন্দ্রনাথ, বেদ, সরস্বতী, আকাশ, বাতাস, হিন্দু, খ্রিষ্টান, পাঠাগার, নদী, বই, শ্রেণি, শিশু, কোরোনা ভাইরাস, এস. সি. ই. আর. টি, ইত্যাদি বোঝায়। এই ধরনের শব্দ বিভক্তি যুক্ত হয়ে বাক্যে প্রযুক্ত হলে, তাকে বিশেষ্যপদ বলে। যেমন— "আত্মশক্তির আবিষ্কারই শিক্ষার উদ্দেশ্য ।"

সর্বনাম - যে সমস্ত পদ বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে। প্রথমে বিশেষ্যর ব্যবহার হয় তারপর পুণরায় বিশেষ্যের উল্লেখ না করে সর্বনাম বসে । যেমন — সুবোধ ভালো তবলা বাজায়, সে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায়। উদাহরণটিতে 'সে' টি সর্বনাম। আমি, তুমি সে, তিনি, যারা, তারা ইত্যাদিও সর্বনাম ।

"**যাহারা তোমার** বিষাইছে বায়ু নিভাইছে **তব** আলো,
তুমি কি **তাদের** ক্ষমা করিয়াছ, **তুমি** কি বেসেছে ভালো"

বিশেষণ - যে পদ বিশেষ্যের গুণ, ধর্ম, অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা ইত্যাদি জানিয়ে দেয়, সেই পদকে বিশেষণ পদ বলে। বিশেষণ পদটি বিষয়কে পরিষ্কার করে বুঝতে সাহায্য করে। যেমন —

খারাপ কাজ করবে না।

ভালো শিক্ষা জীবনের সম্পদ।

ভারতের **পবিত্র** নদীর নাম কী ?

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

ক্রিয়া - বাক্যের মধ্যে যে পদের দ্বারা বিশেষ্যের যাওয়া, আসা, করা, থাকা, খাওয়া ইত্যাদি কোন কাজ করা বোঝায়, সেই পদকে ক্রিয়াপদ বলে যেমন —

বৃষ্টি **পড়ে** টুপুর টাপুর

নদে **এল** বান

শিব ঠাকুরের বিয়ে **হল** চার কন্যা দান।

ক্রিয়া মূলত দুই প্রকার — সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া—

সমাপিকা ক্রিয়া - যে ক্রিয়াতে বাক্য শেষ হয়ে যায়। আর বলবার শুনবার কিছু থাকে না, সেই ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন —

একদিন সকলকে মরতে **হবে**।

শিক্ষা দ্বারা দেশের দশা ও দিশার পরিবর্তন **হয়**।

অসমাপিকা ক্রিয়া - যে ক্রিয়া বাক্য শেষ করতে পারে না, আর কিছু শুনবার বা বলবার আকাঙ্খা থেকে যায় সেই ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন — মন দিয়ে পড়াশুনা **করলে** ভাল ফল পাবে। যদি 'করলে' এর পর বক্তা চুপ হয়ে যেত, তাহলে বাক্যটি সম্পূর্ণ হত না। তাই এর নাম অসমাপিকা ক্রিয়া।

অব্যয় - বাংলা ভাষায় এমন কিছু কিছু পদ বাক্যে ব্যবহৃত হয় যাদের লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি প্রভৃতির পরিবর্তনে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। এই সব পদকে অব্যয় বলে। যেমন —

আপনি **তো** বলেই খালাস, **কিন্তু** ঠেলা সামলাবে কে ?

সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস আর অসৎ সঙ্গে নরকবাস।

যদু **ও** মধু দুই বন্ধু।

এছাড়া আরও উদাহরণ হল এবং, সুতরাং, অতএব, বরং, তবু ইতাদি ।

বাক্য - যে কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়মে সুসজ্জিত পদের দ্বারা মনের কোনো একটি ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, তাদের সমষ্টিকে বাক্য বলে। এখানে 'সুসজ্জিত' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । বাক্যে প্রযুক্ত পদের সংখ্যা যাই হোক না কেন, প্রত্যেকটি বাক্যের দুটি প্রধান অংশ থাকে উদ্দেশ্য ও বিধেয়—

1. **উদ্দেশ্য** - যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তা হলো বাক্যের উদ্দেশ্য । যেমন — "পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল"

কে রব করে ? - পাখি। এতএব বাক্যটি পাখিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। সেইজন্য 'পাখি' উদ্দেশ্য ।

2. **বিধেয়** - উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তা বাক্যের বিধেয়। যেমন "পাখি"সব করে রব রাতি পোহাইল" পাখি কি করে? ... রব (ধ্বনি/আওয়াজ)। এই অংশটি দ্বারা পাখির সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে। অর্থাৎ "করে রব রাতি পোহাইল" - এই অংশটি বিধেয়।

সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম, একাধিক বর্ণের সার্থক সমন্বয়ে যেমন পদের সৃষ্টি, তেমনি একাধিক পদের সুষ্ঠ বিন্যাসে বাক্যের সৃষ্টি।

বাক্যের ত্রিশর্ত - বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলির তিনটি শর্ত থাকা চাই তবেই সার্থক বাক্য হবে। এই তিনটি শর্ত হলো —

1. আসত্তি
2. যোগ্যতা ও
3. আকাঙ্ক্ষা ।

1. **আসত্তি** - বাক্যের বিভিন্ন অংশ সঠিক স্থানে স্থাপন করার নাম হল আসত্তি । সংসারে যার সে গুণ বড় হয় বড় - এটি বাক্য নয়। বাক্যের প্রতিটি পদ রয়েছে, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে থাকার পলে ভাবপ্রকাশের অসুবিধা হচ্ছে। আসল বাক্যটি হল- সংসারে সে বড় হয়, বড় গুণ যার।

2. **যোগ্যতা** - শুদ্ধ বাক্যের যোগ্যতা থাকে । অগ্নিমিত্রা আগুনে সাঁতার শিখছে । মানুষ জলে সাঁতার শেখে-আগুনে নয়। এই বাক্যে পদক্রম সঠিক হলেও বাস্তবের সঙ্গে অমিল । অর্থাৎ বাক্যের যোগ্যতা পূরণ করতে পারেনি । সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে — শুদ্ধ বাক্য

3. **আকাঙ্ক্ষা** - বাক্যের কিছু অংশ বলবার পর বাকি অংশটুকু প্রকাশ করার জন্য বক্তার যেমন আগ্রহ থাকে, না বলা অংশটি শোনবার জন্য শ্রোতারও মনে তেমনি একটি আগ্রহ জন্মায়। পদগুলি যদি এই আগ্রহ মেটাতে সক্ষম হয়, তবেই সেই বাক্যটির আকাঙ্ক্ষা আছে বুঝতে হবে। "পূর্ণিয়া বিহার রাজ্যের" এটুকু বলে যদি আর কিছু না বলা হয়, তাহলে বাকি অংশটি শোনবার জন্য শ্রোতার মন ব্যাকুল হয়ে উঠবে। সেই ব্যাকুলতা দূর করবার জন্য যখন বলা হয় "একটি কৃষিপ্রধান জেলা" তখন শ্রোতার ব্যাকুলতা দূর হয় এবং বক্তারও আকুলতা মিটে যায়। অর্থাৎ বক্তা - শ্রোতা সকলেরই আকাঙ্ক্ষা মেটাবার ক্ষমতা বাক্যটির আছে।

অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষারও **ব্যাকরণ** আছে। মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ খুবই প্রয়োজনীয়। ভাষাকে যথাযথ ভাবে শিখতে, নির্ভুল ভাবে তার প্রয়োগ করতে ব্যাকরণই সাহায্য করে। শুদ্ধ ভাষার গঠনে ব্যাকরণের বিভিন্ন উপাদানগুলি অপরিহার্য। ব্যাকরণ ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপকে প্রকাশ করে। এই কারণেই ব্যাকরণের ধ্বনি, শব্দ, উপসর্গ, সন্ধি, সমাস ইত্যাদির জ্ঞান আবশ্যক।

ধ্বনি - সাধারণ ভাবে বলা যায়, কানে শোনা যায় এমন যে কোন শব্দই ধ্বনি। বিশেষভাবে মানুষের উচ্চারিত যে কোন প্রকার শব্দও ধ্বনি। এইরকম একটি ধ্বনির উচ্চারণ স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট কোন রূপ নিয়ে প্রকাশ পেলে তাকে বলা হয় বর্ণ । প্রত্যেক ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও কয়েকটি মূল বা প্রধান স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনি আছে।

স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

		সম্মুখ স্বরধ্বনি	কেন্দ্রীয়স্বরধ্বনি	পশ্চাৎ স্বরধ্বনি		
↑ প্রসারিত স্বরধ্বনি ↓	উচ্চ স্বরধ্বনি	ই		উ	সংবৃত স্বরধ্বনি	↑ কুঞ্চিত স্বরধ্বনি ↓
	উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত স্বরধ্বনি	
	নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি	অ্যা		অ	অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি	
	নিম্ন স্বরধ্বনি		আ		বিবৃত স্বরধ্বনি	

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

ধ্বনির নাম	অঘোষ		ঘোষ		নাসিক্য	বর্গীয় বর্ণ
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	
কণ্ঠ ধ্বনি	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	ক - বর্গীয়
তালব্য ধ্বনি	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	চ - বর্গীয়
মূর্ধন্য ধ্বনি	ট	ঠ	ঢ	ড	ণ	ট - বর্গীয়
দন্ত্য ধ্বনি	ত	থ	দ	ধ	ন	ত - বর্গীয়
ওষ্ঠ্য ধ্বনি	প	ফ	ব	ভ	ম	প - বর্গীয়

অন্তঃস্থ বর্ণ	য	র	ল	ব	শ	
	ষ	স	হ	ড়	ঢ়	
	য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ	

অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি — শ, ষ, স

কম্পনজাত ধ্বনি - র

ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি — ঢ, হ

তাড়নজাত ধ্বনি - ড়, ঢ়

উষ্ম / শিসধ্বনি — শ, ষ, স, হ

পার্শ্বিক ধ্বনি — ল

জেনে রাখা ভাল —

বাংলা ভাষাতে মোট বর্ণসংখ্যা — 51টি (স্বরবর্ণ 11 + ব্যঞ্জনবর্ণ 40টি)

ধ্বনি — 39টি (স্বরধ্বনি 07 + ব্যঞ্জনধ্বনি 32 টি)

অনুস্বর - 'ং' (অনুস্বর) বাংলা ভাষার ব্যঞ্জন বর্ণ মালার অন্যতম বর্ণ। এটি স্বর বা ব্যঞ্জন যে কোন ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে। যেমন — সংবিধান, সংশোধন ইত্যাদি। অনুস্বর কখনও কোন শব্দের শুরুতে বসে না। আধুনিক বাংলায় অনুস্বর 'ঙ' রূপে উচ্চারিত হয় ফলে লেখাতেও ং-র জায়গায় ঙ দেখা যায়, যেমন — রং **>** রঙ, ঢং **>** ঢঙ ইত্যাদি। অবশ্য তৎসম শব্দে ং অক্ষত থাকে, যেমন — বংশ, জিঘাংসা, হিংসা ।

নাসিক্য বা আনুনাসিক ধ্বনি - ঙ, ঞ, ণ, ন, ম-ব্যঞ্জন বর্ণমালায় এই বর্ণগুলিকে আনুসাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি বলা হয়। বাংলার স্বরধ্বনি গুলিকেও আনুনাসিক করে উচ্চারণ করা হয়। যেমন —চাঁদ, আঁশ, দাঁত, আঁচল ইত্যাদি । সাধারণভাবে বলা যায়, মুখ এবং নাকের মিলিত প্রচেষ্টায় এই আনুনাসিক ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়। বাংলায় চন্দ্রবিন্দু (ঁ) দিয়ে সানুনাসিক ভাব দেখানো হয়।

রূঢ় শব্দ - যে শব্দকে ভাঙলে তার অর্থ নষ্ট হয়ে যায়, তাকে বলে রূঢ় শব্দ। যেমন— নাক, কান, পর, ভাই ইত্যাদি । এখানে না এবং ক, কা এবং ন, প এবং র, ভা এবং ই আলাদা ভাবে অর্থহীন ।

যৌগিক শব্দ - যৌগিক শব্দ হলো এমন শব্দ যা দুটি শব্দের মিলনে তৈরি হয় এবং যাকে আলাদা করলেও তা অর্থবহ থাকে । দুই অথবা দুইয়ের বেশি শব্দের যোগে যৌগিক শব্দ গঠিত হয়। যথা - দুধ-ওয়ালা, ঘোড় - সওয়ার ইত্যাদি । এখানে প্রত্যেক শব্দের দুটি করে অংশ রয়েছে এবং দুটি অংশই অর্থবহ। 'দুধ' এবং 'ওয়ালা' দুটি শব্দেই অর্থ আছে আলাদা ভাবে। ঘোড়া ও সওয়ার আলাদা ভাবে অর্থ যুক্ত।

যোগরূঢ় শব্দ - যোগরূঢ় শব্দও এক হিসাবে যৌগিক শব্দ অর্থাৎ এর মধ্যেও দুটি শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু এর অর্থ বিচার করলে দেখা যায়, নিজের সামান্য অর্থ না বুঝিয়ে, তা একটি অন্য বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। একে বলা হয় যোগরূঢ় শব্দ। যেমন— চক্রপাণি, পঙ্কজ, লম্বোদর ইত্যাদি । পঙ্ক + জ- এর সাধারণ অর্থ হলো, যা পঙ্ক বা কাদায় জন্মায় । কিন্তু শব্দটির বিশেষ অর্থ হলো কমল বা পদ্মফুল। এইরকম চক্রপাণি শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণ। সাধারণ অর্থে যার হাতে চক্র রয়েছে। বিশেষ অর্থে লম্বোদর অর্থ গণেশ, এবং সাধারণ অর্থ হলো, যার উদার বা পেট বিশাল আকারের।

তৎসম শব্দ - তৎ (সংস্কৃত) + সম (সমান) - বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারের মৌলিক শব্দগুলির মধ্যে তৎসম হলো সেই শব্দ যা সংস্কৃত ভাষা থেকে অবিকৃত ভাবে সরাসরি বাংলায় চলে এসেছে । যেমন — নক্ষত্র, বৃক্ষ, সূর্য ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দ - তৎ (সংস্কৃত) + ভব (জাত) - যে তৎসম শব্দগুলি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে বাংলায় এসেছে সেই শব্দগুলি হলো তদ্ভব শব্দ। যথা, চন্দ্র > চাঁদ, রাত্রি > রাত।

অর্ধ তৎসম শব্দ — কিছু শব্দ স্বাভাবিক ভাবে পরিবর্তিত না হয় খানিকটা বিকৃত ভাবে বাংলায় চলে এসেছে, সেগুলিকে অর্ধ তৎসম শব্দ বলে। যেমন— প্রণাম > পেন্নাম, রৌদ্র > রোদ্দুর, ঘৃণা > ঘেন্না ইতাদি।

দেশী শব্দ — যে সকল শব্দ বাংলা বসবাসকারী দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষের ভাষা থেকে অবিকৃত বা সামান্য বিকৃত হয়ে বাংলা শব্দভান্ডারে স্থান পেয়েছে তাদের দেশি শব্দ বলে যেমন — মুঠে, ঢাক, কোপাই, হাঁক, ইত্যাদি।

আগন্তুক শব্দ ঃ আগন্তুক শব্দ, দুই প্রকার —

বিদেশি শব্দ — তুর্কি, ফরাসি, পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, আরবি প্রভৃতি বিদেশীদের থেকে যে শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে এসেছে

তাদের বিদেশি শব্দ বলে। যেমন — অফিস, ডাক্তার (ইংরেজি); মুসাফির, ফকির (আরবি); রেস্তোরাঁ, কাফে (ফরাসি) ইত্যাদি ।

প্রতিবেশি শব্দ — ভারতের অন্য প্রদেশের মানুষের সঙ্গে মেলা মেশার ফলে তাদের ভাষা থেকে যে সকল শব্দ বাংলা শব্দভান্ডারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের প্রতিবেশী শব্দ বলে। যেমন — হাতিয়ার, লগাতার (হিন্দি), হরতাল, খাদি (গুজরাটি), তড়কা, চাহিদা (পাঞ্জাবি) ।

প্রত্যয় - শব্দ প্রকৃতি ও ধাতু প্রকৃতির পরে যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যোগ করে নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়, সেই সমস্ত বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিকে প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় দুই রকম - কৃৎ প্রত্যয় এবং তদ্ধিত প্রত্যয়।

কৃৎপ্রত্যয় - ধাতুর সঙ্গে যে প্রত্যয় যোগ করে শব্দ গঠন করা হয়, তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। বাংলায় অ, অন্, ই, অন্য, আই ইত্যাদি কৃৎ প্রত্যয় গুলি পাওয়া যায় ।

যেমন — কাঁদ্ + অন্ = কাঁদন

কর্ + অ = কর

রাঁধ্ + না = রান্না

বিনা + উনি = বিনুনি ।

তদ্ধিত প্রত্যয় - শব্দের সঙ্গে যে প্রত্যয়গুলি যুক্ত হয়, সেগুলিকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলা হয়। বাংলায় আ, অই, আই, আলি ইত্যাদি প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়ে থাকে। উদাহরণ -

রোগ + আ = রোগা

কান + আই = কানাই

মিত + আলি = মিতালি

উপসর্গ ঃ

যে সমস্ত অব্যয় পদ ধাতু বা শব্দের আগে যুক্ত হয়ে ঐ ধাতু বা শব্দের অর্থকে বিশিষ্টতা দান করে তাকে উপসর্গ বলে। উপসর্গের নিজস্ব কোন অর্থ নেই। উপসর্গ তিন প্রকার — সংস্কৃত উপসর্গ, বাংলা উপসর্গ এবং বিদেশী উপসর্গ ।

উদাহরণ —

সংস্কৃত উপসর্গ

প্র — প্রবাহ, প্রবেশ

অনু - অনুসরণ, অনুবাদ

বি - বিচার, বিখ্যাত

বাংলা উপসর্গ —

অনা – অনাচার, অনাবৃষ্টি

কু – কুদিন, কুকাজ

পাতি – পাতিলেবু, পাতিহাঁস

বিদেশী উপসর্গ —

হর – হরদম, হররোজ

হেড – হেডপন্ডিত, হেড অফিস

খাস – খাসখবর, খাসমহল

সন্ধি -

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি বর্ণের মিলনের নাম সন্ধি । অনেক সময় তাড়াতাড়ি উচ্চারণের কারণে সেই দুটি বর্ণের মধ্যে আংশিক বা পূর্ণ মিলন হয়। এর ফলে কখনও একটি বর্ণের লোপ হয়। এই পরিবর্তনকে সন্ধি বলা হয়।

খাঁটি বাংলায় সাধারণত দুই রকম সন্ধি হয়। স্বর সন্ধি ও ব্যঞ্জন সন্ধি ।

স্বর সন্ধি - স্বরবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনকে স্বর সন্ধি বলা হয়।

মন + অন্তর = মনান্তর (অ + অ)

চাষ + আবাদ = চাষাবাদ (অ + আ)

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় (আ + আ)

মহা + আকার = মহাকাশ (আ + আ)

ব্যঞ্জন সন্ধি - স্বর সন্ধির মতো ব্যঞ্জন সন্ধিতেও দ্রুত উচ্চারণের জন্য পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মিলন হয়। ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির, স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জন ধ্বনির এবং ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জন ধ্বনির মিলনকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলা হয়।

উদাহরণ —

প্রতি + এক = প্রত্যেক

উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ

আ + ছাদন = আচ্ছাদন

ষট্ + আনন = ষড়ানন

এছাড়া, কোন বিশেষ নিয়ম অনুয়ায়ী যে সব, সন্ধি হয় না, তাদের আমরা বলি **নিপাতন সিদ্ধ সন্ধি**।

যেমন —

গো + অক্ষ = গবাক্ষ

বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি

সীমন + অন্ত = সীমান্ত

সমাস —

বীণা পাণিতে যার - বীণাপাণি

রাজার পুত্র - রাজপুত্র

নীল যে আকাশ - নীলাকাশ

চরণ পদ্মের মতো - চরণ পদ্ম

দশ আনন (মুখ) যার - দশানন

এই উদাহরণগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বীণা ও পাণির মধ্যে, রাজা এবং পুত্রের মধ্যে, নীল ও আকাশের মধ্যে, চরণ ও পদ্মের মধ্যে, দশ এবং আননের মধ্যে অর্থগত সম্বন্ধ রয়েছে। এগুলিকেই সমাস বলে। সমাস কথাটির অর্থ সংক্ষেপ। বাক্যকে সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর করে তুলতে সমাসের প্রয়োজন হয়। সমাসের মধ্যে সমস্যমান পদ, পূর্বপদ, পরপদ, ব্যাসবাক্য, সমাস বদ্ধ পদ থাকে। উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টিকে পরিষ্কার ভাবে দেখানো যেতে পারে। বীণা পাণিতে যার - বীণাপাণি। এখানে বীণা ও পাণি হলো সমস্যমান পদ। বীণা পূর্বপদ, পাণি পরপদ, আবার বীণা যার, এই অংশটি ব্যাসবাক্য এবং 'বীণাপাণি' শব্দটি সমাসবদ্ধ পদ। সমাসে কখনও পূর্বপদের, কখনও পরপদের প্রাধান্য দেখা যায়। অনেক সময় উভয় পদেরই প্রাধান্য থাকে।

পূর্ব পদের প্রাধান্য - চরণপদ্ম

পরপদের প্রাধান্য - উড়ো জাহাজ ।

উভয় পদের প্রাধান্য - রাজর্ষি ।

অনেক ক্ষেত্রে পূর্বপদ বা উত্তর পদ কোনটিকেই প্রাধান্য না দিয়ে তৃতীয় একটি পদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যেমন, কৃত্তিবাস (কৃত্তি = বাঘের ছাল, বাস = বসন) এখানে অন্য অর্থে শিবকে বোঝানো হয়েছে । বাঘের ছাল বা বস্ত্র কোনটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়নি।
এখানে অন্য অর্থে শিবকে বোঝানো হয়েছে । বাঘের চাল বা বস্ত্র কোনটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়নি।

সমাস মুখ্যতঃ সাত প্রকার —

দ্বন্দ্ব সমাস ঃ যে সমাসে দুটি পদেরই প্রাধান্য দেখা যায় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে । উদাহরণ —

বাপ ও মা, = বাপমা

জামাতা ও পুত্র= জামাতাপুত্র ।

তৎপুরুষ সমাস — যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদ প্রধান হয়। তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

যেমন— বন্ধন হইতে মুক্ত = বন্ধনমুক্ত

রাষ্ট্রের পতি = রাষ্ট্রপতি

কর্মধারায় সমাস — এখানে পরপদের প্রাধান্য । পূর্বপদ বিশেষ্য, পরপদ বিশেষণ হয়। কখনও দুটি পদই বিশেষ্য অথবা দুটি পদই বিশেষণ হয়। একে বলা হয় কর্মধারয় সমাস। এই সমাসে কখনও পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্যও হয়ে থাকে।

উদাহরণ — যিনি রাজা তিনিই ঋষি = রাজর্ষি

নীল যে উৎপল = নীলোৎপল

বহুব্রীহি সমাস - যে সমাসে পূর্বপদ অথবা উত্তরপদ কোনটিই প্রধান না হয়ে তৃতীয় একটি অর্থ প্রকাশ করে তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

উদাহরণ — দশ আনন যাহার- দশানন (রাবণ)

পীত অম্বর যাহার - পীতাম্বর (শ্রীকৃষ্ণ)

দ্বিগু সমাস - যে সমাসে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ ও পরপদটি বিশেষ্য হয় এবং সমাসবদ্ধ পদটির দ্বারা সমষ্টি বা সমাহার বোঝায় তাকে দ্বিগু সমাস বলে। উদাহরণ —

তিনটি পদের সমাহার - ত্রিপদী

পঞ্চ নদীর সমাহার - পঞ্চনদী ।

অব্যয়ীভাব সমাস - যে সমাসে সমস্ত পদের মধ্যে একটি অব্যয় থাকে, এবং সমস্যমান পদগুলির মধ্যে পূর্বপদের প্রাধান্য দেখা যায় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। উদাহরণ —

ভাতের অভাব = হাভাত

কুলের সমীপ - উপকূল ।

নিত্যসমাস - এই সমাসে ব্যাসবাক্য থাকে না অথচ ব্যাসবাক্য গঠন করতে অন্য পদের প্রয়োজন হয় একে বলে নিত্য সমাস।

উদাহরণ - অন্যগ্রহ - গ্রহান্তর

পূজার নিমিত্ত = পূজার্থ ।

সারাংশ ঃ

ভারতীয় আর্যভাষার কথ্যরূপ থেকে প্রাচ্যভাষা, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার মধ্য দিয়ে পরিবর্তনক্রমে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। ভারতীয় আর্য ভাষার তিনটি পর্যায় - প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা, মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা এবং নব্য ভারতীয় আর্যভাষা। বাংলাভাষা এই নব্যভারতীয় আর্যভাষা থেকে এসেছে। হিন্দি, পাঞ্জাবী, মারাঠি, গুজরাটি, ওড়িয়া, অসমিয়া ইত্যাদি ভাষাগুলিও এই বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত। বাংলা ভাষাও অন্যান্য ভাষার মতো মুখের ভাষা অর্থাৎ কথ্য ভাষা এবং লেখার ভাষা- এই দুটি ভাগে বিভক্ত । ভাষাকে মাধ্যম করে সাহিত্য রচিত হয়। বাংলায় লেখার ভাষাকে সাধু এবং চলিত দু-ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। সংস্কৃতের অনুকরণে সাধুভাষার সৃষ্টি হয়েছে এবং কলকাতা অঞ্চলের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের ব্যবহৃত কথ্যভাষাকে চলিত ভাষা রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বাংলা ভাষা সৃষ্টির আদিযুগ থেকে আধুনিক যুগের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সাধুভাষারই প্রাধান্য ছিল সাহিত্য রচনায়। পরবর্তী কালে বাংলা ভাষা আদিযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্য দিয়ে সাহিত্য রচনার ধারায় এগিয়ে চলেছে। আধুনিক যুগের প্রায় দ্বিতীয়ার্ধে এসে সাহিত্যে সাধুভাষার পাশাপাশি চলিত ভাষাও নিজের জায়গা করে নিয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় - নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধদিতে বর্তমানে চলিত ভাষারই প্রাধান্য। চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রথম কৃতিত্ব প্রমথ চৌধুরীর। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক রবীন্দ্রনাথের অবদানও এতে কম নয়। স্বামী বিবেকানন্দও চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনার সমর্থক ছিলেন।

ভাষাকে সুগঠিত ও নিয়মবদ্ধ করে তোলে সেই ভাষার ব্যাকরণ। বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নানা উপাদান এই ভাষাকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে অন্যান্য ভাষার মতোই নানারকম শব্দাবলী রয়েছে। বাংলার কিছু মৌলিক শব্দ আছে - সংস্কৃত থেকে গৃহীত তৎসম শব্দ, সামান্য বিকৃত অবস্থায় চলে আসা অর্ধ-তৎসম শব্দ এবং স্বাভাবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আগত তদ্ভব শব্দ। এছাড়া দেশি, বিদেশি, প্রাদেশিক বিভিন্ন ধরনের শব্দ বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধশালী করেছে। আঞ্চলিক উপভাষাগুলির বাংলা ভাষার আরেক রূপ। অন্যান্য ভাষার মতোই বাংলা ভাষাকে মাধ্যম করে বাংলা সাহিত্য ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের সময়ে এই ভাষার বিশিষ্ট উচ্চারণ পদ্ধতি, ভাষা গঠন সম্পর্কিত ধারণা, ব্যাকরণ বিষয়ক নিয়মাবলী ইত্যাদি যথাযথ মনে রাখতে হবে।

অনুশীলনী

1. পদ কাকে বলে? পদ কয় প্রকার ও কী কী ? প্রতিটি পদের পরিভাষা ও উদাহরণ দাও ।
2. বাক্যের ত্রিশর্ত বলতে কী বোঝো ? আলোচনা করো ।
3. বাংলা লিপির উদ্ভবের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখো ।
4. বাংলা ভাষার উৎপত্তি কীভাবে হলো ? নিজের ভাষায় লেখো।
5. বাংলা উপভাষা কয়টি ও কী কী । যে কোন দুটি উপভাষার বৈশিষ্ট্য লেখো।
6. আধুনিক বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো ।
7. ভাষা ও উপভাষার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো ।
8. বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন স্তর বিভাগের পরিচয় দাও ।
9. সমাস কাকে বলে ? সমাস কয় প্রকার ও কী কী ? পরিভাষা ও উদাহরণ সহকারে লেখো ।
10. টীকা লেখো ঃ

A. চলিত ভাষা	D. তদ্ভব শব্দ
B. রাঢ়ী ভাষা	E. সন্ধি
C. শব্দ ভাণ্ডার	F. প্রত্যয়

একক - 3

বাংলা ভাষা শিক্ষণের বিভিন্ন দক্ষতা ও পদ্ধতি

* ভূমিকা (Introduction)
* উদ্দেশ্য (Objectives)
* শ্রবণ বা শোনা (Listening)
* কথন বা বলা (Speaking)
* পঠন বা পড়া (Reading)
* লিখন বা লেখা (Writing)
* মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি (Methods)

"শিক্ষার শেকড়ের স্বাদ তেতো হলেও এর ফল মিষ্টি।"

— অ্যারিস্টটল

একক - 3

বাংলা ভাষা শিক্ষণের বিভিন্ন দক্ষতা ও পদ্ধতি

ভূমিকা ঃ

ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম। ভাষার মাধ্যমে একে অপরের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করা হয়। পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জীবনের হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-নিরাশা সবই মানুষ ভাষার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করে। শিশু জন্মগ্রহণের পর থেকে স্বাভাবিক নিয়মেই তার ভাষার ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে শুধু মাত্র চারপাশের বিভিন্ন শব্দধ্বনি শুনতে পায়। শিশুর ভাষা বিকাশ বা ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে অনুকরণ বা অনুরণন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশু প্রথমে একটি দুটি অক্ষর যেমন বা বা, মা মা তারপর আরো শব্দ এবং পরিশেষে একটি পূর্ণ বাক্য বলতে শেখে । এইভাবেই একটি শিশু প্রারম্ভিক পর্যায়ে ভাষা দক্ষতা অর্জন করে থাকে।

শিশুর কল্পনা শক্তি, চিন্তাশক্তি ভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়। শিশু নানা বিষয় নিয়ে কল্পনা, বিচার বিশ্লেষণ, আলোচনা, যুক্তি-তর্ক প্রভৃতি নিজের ভাষার সাহায্যে করে থাকে । শিশুর ভাষার বিকাশ কয়েকটি স্তরের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়। প্রথম স্তরে শিশুরা স্বর বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করতে শেখে। দ্বিতীয় স্তরে কিছু শব্দ অনুকরণ করতে পারে। তৃতীয় স্তরে শিশু দৃশ্যগত বস্তু সমূহের নাম বলতে পারে। চতুর্থ স্তরে শিশু এলোমেলো ভাবে কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। অন্যকে কথা বোঝাতে ঈশারা - ইঙ্গিতের ব্যবহার করে। পঞ্চম স্তরে কোনো ইঙ্গিত ছাড়াই কথার অর্থ বুঝতে পারে, যৌগিক বাক্য বলতে পারে। বিমূর্ত শব্দগুলি সম্পর্কে ধারণা জন্ম নেয় এবং সেইগুলি বলতে পারে। সপ্তম স্তরে শিশু ভাষা পড়তে লিখতে পারে । এই ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে শিশুর ধীরে ধীরে ভাষার প্রতি দক্ষতা জন্ম নেয়।

উদ্দেশ্য ঃ

* শিক্ষার্থী বাংলা ভাষাতে মনের ভাব প্রকাশ করার বিভিন্ন কৌশল দক্ষতা, যেমন— শ্রবণ, কথন, পঠন এবং লিখন সম্পর্কে অবগত হবে ।
* শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন দক্ষতা / কৌশলের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে।
* ভাষা শিক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ও বোধশক্তির বিকাশ এবং সুস্থ, সুন্দর মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে দক্ষতাগুলির কার্যকারিতার সম্বন্ধে জানতে পারবে ।
* বিভিন্ন পদ্ধতি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) সম্পর্কে অবগত হবে ।

বাংলা ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন দক্ষতা বা ধাপ (অবলোকন, অর্থগ্রহণ ও প্রয়োগ) ঃ

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। NEP - 2020 তে প্রারম্ভিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বয়সসীমা এবং শ্রেণিকক্ষের স্পষ্ট বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। পূর্বের শ্রেণিকক্ষের বিভাজন 10 + 2 -র পরিবর্তে 5 +3+3+4 করা হয়েছে। প্রারম্ভিক শিক্ষার (Foundation Stage) প্রথম তিন বছর ভারমুক্ত শিক্ষা অর্থাৎ খেলাধূলা ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের (Activity) মধ্যে দিয়ে শিশু বিদ্যালয়মুখী হবে। এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে শিশুরা মনের কথা প্রকাশ করতে পারে। এরপর প্রতিটি স্তরের মধ্যে দিয়ে এই দক্ষতার প্রকাশ পূর্ণতা পায়। যে কোনো ভাষা শিক্ষাদান ও ভাষা শিক্ষণের দ্বারা জ্ঞানের প্রয়োগ মূলত চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে —

১. কথা শুনে বোঝা (শ্রবণ)

২. কথা বলে অন্যকে বোঝানো (কথন)

৩. লিখিত রূপ পড়তে পারা (পঠন)

৪. লিখিত রূপ প্রকাশ করতে পারা (লিখন)

ভাষা দক্ষতার এই চারটি দিক অবশ্যই কোন ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর মানসিক, সামাজিক ও চারিত্রিক দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করে। এই চারটি নৈপুণ্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল ও পরিপূরক ।

এই স্তরের শিক্ষার্থীরা কোন জিনিসকে বা বিষয়কে বিশেষ ভাবে বুঝবে, তার অর্থগ্রহণ করবে ও সঠিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করতে শিখবে। কোনো বিষয়কে দেখা বা বোঝার পরে তার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়। শিক্ষার্থীরা অন্যের কথা শুনে তার যথাযথ মমার্থ অনুধাবন ও তার অর্থগ্রহণ করতে পারবে। বাক্শক্তির সাহায্যে ভাষার মাধ্যমে নিজের মনোভাব ও অনুভূতিকে যথার্থভাবে প্রকাশ করতে পারবে। আবার পঠনের সাহায্যে লিখিত বস্তুর মমার্থ উপলব্ধি করে শিক্ষার্থী তার নিজের মনের ভাবকেও যেন যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থ না বুঝে পাঠ প্রস্তুত করা বা উদ্দেশ্যহীন ভাবে অধ্যায়ণরত থাকা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়।

শিক্ষার্থী যা দেখলো, যে অর্থগ্রহণ করলো সেখানেই তার শেষ নয়। সে তার ভাষার প্রয়োগ যথার্থভাবে করছে কিনা তাও দেখতে হবে। যা সে বলতে চায় তা সহজে পরিষ্কার ভাবে বলতে হবে, যা লিখতে চায় তা সহজে ও পরিষ্কার ভাবে লিখতে হবে। ভাষা প্রয়োগের গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বা দক্ষতা আনার জন্য শিক্ষার্থীকে কোনো স্থানের বিবরণ, কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের কথা, জীবনের কোন ঘটনার কথা, দু-চার লাইন কবিতা লেখার অভ্যাস প্রয়োজন। তাই তাদের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও ছোটোদের জন্য লেখা বিভিন্ন বই বা পত্র পত্রিকা পড়ার অভ্যাস ও আগ্রহ তাদের মধ্যে জাগাতে হবে।

A. শ্রবণ বা শোনা (Listening)

ভাষা মনুষ্য সমাজের এক অপরিহার্য মাধ্যম । এই ভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় মাতৃগর্ভ থেকেই। সেই সময় থেকেই শ্রবণেন্দ্রীয় সজাগ থাকে। এর দৃষ্টান্ত পুরাণেও পাওয়া যায়। বৈদিক যুগ থেকেই শ্রুতির ব্যবহার ছিল কারণ সে সময়ের মানুষ লিখতে পড়তে জানতো না। তারা শুনে শুনে কথা বা শ্লোক মনে রাখত। ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে শ্রবণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ভাষার দক্ষতা বিকাশে শ্রবণ একটি মাধ্যম। কোনো কিছু শিখনের পূর্বে বা বলার পূর্বে মনোযোগপূর্বক শোনা আবশ্যক। শ্রবণের মধ্যে দিয়েই বলার দক্ষতা গড়ে ওঠে। শিশুরা যা শোনে তাই বলার চেষ্টা করে। শিখন ক্ষেত্রে শোনা বা শ্রবণ বলতে বোঝায় কোনো কিছু শুনে তার অর্থ বুঝতে পারা এবং তা বলা। বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রবণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যে শিশু যত ভালো শ্রবণ শক্তিকে কাজে লাগাতে পারবে সে তত দ্রুত সঠিকভাবে ভাষাকে আত্মস্থ করতে পারবে। একটি শিশু নানা ধরনের কোলাহলের মধ্যে বেড়ে ওঠে। তার শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে সজাগ করতে পারে নানা ধরনের ধ্বনি। শিশুদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় যথাসম্ভব শুদ্ধ উচ্চারণ করা উচিত কারণ শিশুরা শ্রবণের সাহায্যে, অনুসরণের মাধ্যমে ভাষাকে আয়ত্ত করতে শেখে। শিশুর বলার ক্ষমতা নির্ভর করে সঠিকভাবে শোনার উপরে। কোনো কিছু জানতে হলে প্রথমে শুনতে হয়। তাই জানার ক্ষেত্রে শোনার গুরুত্ব অত্যাধিক । শোনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল শব্দ বা বাক্যগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা, অনুধাবন ও প্রয়োজন বোধে তা প্রয়োগ করতে শেখা ।

উদ্দেশ্য ঃ

* শ্রবণ দ্বারা শিশুকে ভাষা শেখানো যায় ।
* শুনে বলার চেষ্টায় ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।
* শুনতে শুনতে শব্দ সংকেতগুলো চিনতে শেখা, যার মাধ্যমে বোধশক্তির বিকাশ ঘটে ।
* শুনলে বলার আগ্রহ জাগে ।
* ভাল শ্রোতা হওয়া ।

শ্রবণের প্রকার ঃ

শ্রবণকে নিম্নলিখিত কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যায়—

(1) **মনোযোগ সহকারে শ্রবণ** — এইরূপ শ্রবণে শ্রোতা যা শোনে তার প্রতি তার সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকে। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যত বেশি মনোযোগী হবে ততই সে শিক্ষনীয় বিষয়টি ভালভাবে আয়ত্ব করতে পারবে। বেশি দিন মনে রাখতে সক্ষম হবে।

(2) **মনোযোগ বিহীন শ্রবণ** — এই জাতীয় শ্রবণে শ্রোতা যা শোনে তার প্রতি কোনো মনোযোগ বা আকর্ষণ থাকে না। তার মনে কোনো রকম রেখাপাত না হওয়াতে শোনা বিষয় ভুলে যায়। এটি মনোবাঞ্ছিত নয় ।

(3) **বাধ্যতামূলক শ্রবণ** — শ্রোতাকে শুনতে বাধ্য করা হয়। এই শ্রবণ শ্রোতার মনে বিরক্তি উৎপাদন করে। আনন্দদায়ক না হয়ে বাধ্যতা মূলক হওয়াতে শ্রোতা কিছুদিন পরে তা মনে রাখতে পারে না ।

(4) **স্বতঃস্ফূর্ত শ্রবণ** — এখানে শ্রোতার মনে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ থাকে, বাধ্যতা থাকে না। আনন্দদায়ক ও মনোযোগ দিয়ে শোনার ফলে দীর্ঘদিন মনে থাকে। গল্প শোনার ক্ষেত্রেও শিশুদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রবণ দেখা যায় ।

(5) **স্বকর্ণে শ্রবণ** — এই জাতীয় শ্রবণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে। নিজের কানে শোনা কোনো বিষয় অনেক বেশি তাৎপর্য হয়। সেইজন্য শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীরা দর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় মাধ্যমে শিক্ষাদান করার উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছে ।

(6) **অপরের বর্ণনা মারফৎ শ্রবণ** — নিজের কানে না শুনে অন্যের মাধ্যমে শোনা । এর তাৎপর্য কম হলেও অনেক সময় অনেক কিছু বর্ণনার মাধ্যমে জানতে হয়। রেডিও ও দূরদর্শনে অনেক কিছু এই রকম ।

কার্যকারী শ্রবণের শর্ত ঃ

কোনো কিছু শোনার ফল ভালভাবে পেতে হলে তা যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলি হল —

* আর্কষণীয় বিষয়
* উপযুক্ত পরিবেশ
* বক্তার বাচনভঙ্গী ও উপস্থাপন ক্ষমতা
* আগ্রহ
* মনোযোগ
* শ্রুতি মাধুর্য
* উৎসাহী মনোভাব।

তাছাড়া শুনতে শেখানোর জন্য শিক্ষককে বিভিন্ন শিক্ষণ উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়, যেমন — মোবাইল, টেপরেকর্ড,

দূরদর্শন প্রভৃতি ।

শ্রবণ দক্ষতাকে বিকশিত করার বিভিন্ন উপায় ঃ

শ্রবণ দক্ষতা বাড়ানোর জন্য শ্রবণ লিপি অনুশীলন ভীষণ প্রয়োজন। সেই সঙ্গে নাট্যাভিনয়, বিতর্কে অংশগ্রহণ, সংবাদ বিধি দ্বারাও শ্রবণ দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। কোন ঘটনা শুনলে বা দেখলে অপরের কাছে তার বর্ণনা করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। শিক্ষক যদি কোন ঘটনা বা সংবাদ মনোগ্রাহী করে শোনাতে পারেন তাহলে তা শিক্ষার্থীকে বেশি প্রভাবিত করবে। বার বার একই ঘটনা ও সংবাদের বিবৃতি দিতে গিয়ে তার ভাষার উপর দক্ষতা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। শ্রবণ পদ্ধতির অন্তর্গত অভিনয় বিধির দ্বারা শিক্ষার্থীরা অভিনীত চরিত্রকে বোঝার ক্ষমতা অর্জন করে। কোনো অনুভূতির প্রকাশ কীভাবে হবে, সেটা শিখতে পারবে। কোনো কিছু বলার সময় কখন কোন শব্দের উপর জোর দিতে হবে বা কীভাবে কোন কথা বা সংলাপ বললে তা বিষযটির উপযুক্ত হবে সেই শিক্ষা লাভ করবে। শ্রবণ দক্ষতাকে বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন টেপ রের্কডার, দূরদর্শন যন্ত্র, সি. ডি ইত্যাদি । এইগুলির ব্যবহারে অমনোযোগী শিক্ষার্থীর মনেও পাঠ্যাংশের কিছু অংশ প্রবেশ করে। আবার ছোট ছোট ছড়ার মাধ্যমেও শ্রবণ দক্ষতার বিকাশ সম্ভব —

'আট এক্কে আট
ঐ তো খেলার মাঠ ।'

শ্রবণ দক্ষতাকে কার্যকরী করে তুলতে শিক্ষক বা বক্তার আবশ্যক গুণ ঃ

স্পষ্ট উচ্চারণ, ভাষায় আঞ্চলিকতা পরিহার, মার্জিত পোশাক, রসাত্মক পাঠদান, শিশুদের নাম ধরে ডাকা, এ সমস্ত গুণাবলী শিক্ষকের মধ্যে থাকলে শিশু শিক্ষার্থীদের শ্রবণ দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে । শিশুদের কানে শোনার সঙ্গে মনোযোগ বৃদ্ধি করার দক্ষতাকে বাড়াতে হবে ।

B. কথন বা কথা বলা (Speaking) ঃ

ভাষা দক্ষতা বিকাশের দ্বিতীয় মাধ্যম হল কথন বা কথা বলা । শিশুর কথা শেখার বয়স থেকেই ভাষার মৌখিক অনুশীলন হয়। মৌখিক ভাষা মানুষ জন্ম সূত্রে পেলেও সুষ্ঠভাবে কথা বলার জন্য যথেষ্ট শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রয়োজন। কথা বলার জন্য শিশুকে বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। বাগ্‌যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি হল ঠোঁট, দাত, জিভ, তালু, মূর্ধ্যা প্রভৃতি। কথা বলার সময় আমাদের বাগযন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলি ব্যবহার করে যেসব ধ্বনি উৎপন্ন করা হয় সেগুলির মধ্যে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি বর্তমান থাকে। স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হতে পারে না। জন্ম থেকে পাঁচ / ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের কথা বলার প্রস্তুতি কাল রূপে ধরা হয়। বলা যায়, মাতৃভাষার অন্তর্গত ধ্বনিগুলি সঠিকভাবে উচ্চারণ করা, সঠিক শব্দ, শব্দগুচ্ছ ও বাক্য ব্যবহার করে মনের ভাব প্রকাশ করাকে বলা হয় কথন। কথা বলার ক্ষমতা শিশু সহজভাবে পেয়ে থাকলেও, কথন দক্ষতা অর্জন ব্যতীত মানুষ সঠিকভাবে মত প্রকাশ বা ভাব বিনিময় করতে পারে না। বলা হয় উত্তম কথন বা বাচনভঙ্গি একটি শিল্প বা কলা । বলার যাদুতে সম্মোহনী শক্তি আছে।

তবে প্রত্যেকের বলার ধরন বা উপস্থাপন ক্ষমতা এক নয়। ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক পরিবেশ, পারিবারিক পরিবেশে ভাষার ধরন পাল্টায় । অনেকের বাড়িতেই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়। যেহেতু আঞ্চলিক ভাষা সর্বজনবোধ্য নয়, এবং উচ্চারণ শুদ্ধতা না থাকায় একে পরিহার করা আবশ্যক ।

উদ্দেশ্য ঃ

* শিক্ষাক্ষেত্রে বলার অভিব্যক্তি বা বলার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ।

* বলার অভিব্যক্তি বা কথন দ্বারা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি ।
* কথন দ্বারা পাঠে আনন্দ লাভ করা এবং পাঠের বিষয়টি বোঝা ।
* নিজের ব্যক্তব্যকে সহজ ভাবে প্রকাশ করা ।
* সুবক্তা হওয়া ।

কথন দক্ষতার সমস্যা সমাধানের নিয়ম ঃ

কথন দক্ষতা অর্জন হেতু কিছু বিষয়ে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন হয়। যদি এই সব দক্ষতা শিক্ষার্থী অর্জন করে তাহলে সে সুবক্তা রূপে প্রতিষ্ঠা পায়—

* শব্দ নিবার্চন
* সঠিক স্বর নিক্ষেপ (Voice Projection) ও শ্বাসাঘাত প্রদান
* কণ্ঠস্বরের প্রয়োজনীয় ওঠানামা (Intonation)
* সুস্পষ্ট উচ্চারণ
* কথা বলার সাবলীল গতি
* অর্নগল কথা বলার ক্ষমতা (Fluency)
* মনের ভাব স্পষ্ট করে বলা
* বাক পটুত্ব
* বক্তব্য বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ও সুস্থ চিন্তাশক্তি অর্থাৎ প্রয়োজনীয় যুক্তি, তর্ক ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন
* বক্তব্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা
* সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ না ঘটানো
* আঞ্চলিক ভাষার পরিহার।
* কথা বলার সময় মুখের নানারকম বিকৃতির কুঅভ্যাস ত্যাগ করা
* দ্রুত কথা না বলা ।

কথন দক্ষতা অর্জনে শিক্ষকের ভূমিকা অথবা ভালো কথাবার্তা শেখানোর কৌশল বা উপায় ঃ

* শিশু যে পরিবেশ থেকে আসে সেই পরিবেশের প্রভাব থাকে তার কথন রীতির মধ্যে। তাই স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণ, যথাযথ শব্দ ব্যবহার, বিদ্যালয় পরিবেশে আঞ্চলিকতা পরিহার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে ।
* প্রার্থনা সভা, খবর বলা, ভ্রমণ, পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্য বিষয়ক, আবহাওয়া বিষয়ক, আলোচনা, তর্ক বির্তক প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিজেকে উপস্থাপন করার সুযোগ করে দিলে কথন দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে ।নির্ভুল বর্ণ ও শব্দ উচ্চারণের অভ্যাস তৈরি হবে।
* ব্যাকরণগত দিকগুলি মাথায় রেখে যেমন — স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন ধ্বনি, ধ্বনি ও বর্ণগুলির স্পষ্ট উচ্চারণের দিকে নজর রাখা।
* সরব পাঠ ও গল্প কথন করানো ।এর ফলে কথন দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের উচ্চারণের ভুল ত্রুটিগুলো দূর হয়ে যাবে। পাঠের সময় বিষয়ের ভাব ও দৈনন্দিন আবেগের সঠিক প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ।
* সংবাদপত্র পাঠ করার অভ্যাস তৈরি করানো, যার ফলে নতুন নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচয় ও মনের জড়তা দূর হয়।
* ছড়া ও আবৃত্তি দ্বারা কথনকে উন্নত করা যায় ।এ সময় নির্দিষ্ট ছন্দ, ভাবভঙ্গিমা, স্পষ্ট ও সঠিক উচ্চারণের দিকেলক্ষ্য রাখতে হবে ।

C. পঠন বা পড়া (Reading)

অন্যের কাছে নিজের মনোভাব প্রকাশ করা, কোনো বিষয় চিন্তাভাবনা, বিচার, বিশ্লেষণ করা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করার জন্য

পঠন দক্ষতার সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয়। শিশু যখন প্রথম পড়তে শেখে তখন সে সরবে বানান করে। বিষয়বস্তুর উচ্চারণ করে অর্থ বোঝার চেষ্টা করে। ভাষার লিখিত রূপ পর্যবেক্ষন করে। তার অর্থ বুঝতে পারা হল পঠনের উদ্দেশ্য । শিশুর পড়বার অভ্যাস যত পরিণত হয় ততই সে পূর্বাপেক্ষা কম সময়ে পঠিত বিষয়ের অর্থ বুঝতে পারে ।

পঠনের সাহায্যে ভাষার অর্থ বুঝতে পারা, পঠন দক্ষতা অজর্নের জন্য বিদ্যালয় কিংবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বিধিবদ্ধ শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনের প্রতি পদক্ষেপে পঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । পঠনের সাহায্যে মানুষ তার জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলে। পঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর সম্বন্ধে পরিচিত হয়। জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত এবং মননশীলতার বিকাশ ঘটে। পঠন আত্মবিকাশ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

উদ্দেশ্য ঃ

* অক্ষর জ্ঞান, শব্দ গঠন এবং বাক্য নির্মাণ ক্ষমতা বিকশিত করা ।
* উচ্চারণের বিভিন্নতা সম্পর্কে জ্ঞান ।
* পঠন মাধ্যমে নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করানো ।
* বিচার শক্তি বৃদ্ধি এবং ভাবের আদান প্রদান করানো ।

পঠনের প্রকার ঃ

পঠন অথবা পাঠ প্রধানতঃ দুইপ্রকারের - সরব পাঠ (Loud Reading) এবং নীরব পাঠ (Silent Reading)

1. **সরব পাঠ ঃ**

যে পাঠে রব বা ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে সরব পাঠ বলে । সরব পাঠের ক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করা প্রয়োজন। সরব পাঠে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাই শিশুদের কাছে সরব পাঠ আনন্দদায়ক। সরব পাঠে দক্ষতা অর্জন না করলে নীরব পাঠের অভ্যাস গঠন করা সম্ভব নয়। সরব পাঠ ভাষা শিক্ষাকে শিশুদের কাছে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলে। সঠিক উচ্চারণ শিখতে পারে। কবিতা পড়ানোর ক্ষেত্রে সরব পাঠ অপরিহার্য।

সরব পাঠের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা ঃ

* সরব পাঠ বর্ণ ও শব্দের সঠিক উচ্চারণে সাহায্য করে ।
* ধ্বনিতত্ত্ব বোঝার পক্ষে সহায়ক ।
* সঠিক বাচনভঙ্গি ও কথনশৈলী বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
* উচ্চারণে আঞ্চলিকতা দোষ পরিহারে সাহায্য করে ।
* ছন্দ ও যতিচিহ্ন ব্যবহারে দক্ষ করে তোলে ।
* সরব পাঠ শিশুদের প্রাণবন্ত করে তোলে ।

সরব পাঠের অসুবিধা ঃ

সরব পাঠের উপযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু অসুবিধাও লক্ষ্য করা যায় —

* সরব পাঠে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগে ।
* সরব পাঠে শ্বাসকার্যের উপর জোর দিতে হয় বলে দেহে ক্লান্তি আসে। ফলে দীর্ঘক্ষণ পড়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়।
* মানসিক একাগ্রতার বেশি প্রয়োজন হয় না।
* অপরের অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে ।
* সরব পাঠে ভুল উচ্চারণ অভ্যাস হয়ে গেলে তা সংশোধন করা কঠিন হয়ে যায়।

সরব পাঠে শিক্ষকের ভূমিকা ঃ

* সরব পাঠের সময় শিক্ষক সক্রিয় থেকে শিক্ষার্থীদের সরব পাঠের যথাযথ উচ্চারণ, স্বর, লয়, গতি, প্রবাহ, যতি চিহ্ন প্রভৃতির ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখবেন।
* প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীদের সরব পাঠ করার সুযোগ দেবেন।
* শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গল্প, কবিতা, আবৃত্তি, নাটকের অডিও শোনাবেন ।

2. **নীরব পাঠ ঃ**

যে পাঠ মনে মনে নীরবে পাঠ করা হয় তাকে বলা হয় নীরব পাঠ। নীরব পাঠে পাঠ্যবস্তুর অর্ন্তগত মূল বক্তব্যগুলি আহরণ করা হয়। শিক্ষার্থীরা সরব পাঠে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করলে তাদের নীরব পাঠে অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। অভ্যাসের দ্বারা নীরব পাঠের গতি বাড়ানো যায়। একটানে যত বেশি সংখ্যক শব্দ পড়ে ফেলার অভ্যাস হবে, ততই নীরব পাঠের গতি বৃদ্ধি পাবে।

নীরব পাঠের উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা ঃ

* এই পাঠ মননশীলতার উপযোগী ।
* অল্প সময়ে অনেক বেশি পড়া যায়, অল্প সময়ে কোনো ধারণাকে আত্মগত করতে সাহায্য করে ।
* অকারণ শক্তি ক্ষয় রোধ করে
* গ্রন্থাগার বা শ্রেণিকক্ষে নীরব পাঠ আবশ্যক ।
* জীবনের প্রতি পদক্ষেপে নীরব পাঠের প্রয়োজন ।
* বিষয়ের প্রতি বিচারশক্তি, চিন্তাশীলতা এবং কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি করতে নীরব পাঠ উপযোগী।

নীরব পাঠের অসুবিধা ঃ

* নীরব পাঠে মনোসংযাগ কম হয়। ফলে পাঠ্যবিষয় আত্মস্থ করতে বেশি সময় লাগে ।
* প্রাথমিক স্তরের শিশুর মন স্বভাবত চঞ্চল হয় বলে নীরব পাঠে শিশু মনোনিবেশ করতে পারে না ।

* নীরব পাঠের কারণে উচ্চারণের শুদ্ধতা অথবা অশুদ্ধতার বিষয়ে জানা সম্ভব হয় না ।
* কণ্ঠস্বরের ওঠানামা, পড়ার সঠিক গতি ইত্যাদি বিষয়েও জানা সম্ভব হয় না ।
* নীরব পাঠে কবিতা এবং অভিনয়ের রস আস্বাদন করা যায় না।

নীরব পাঠে শিক্ষকের ভূমিকা ঃ

* শিক্ষার্থী নীরব পাঠ করতে গিয়ে ফাঁকি দিচ্ছে কিনা তা জানার জন্য নীরব পাঠের মাঝে পাঠ বিষয়ক প্রশ্ন করবেন।
* শিক্ষার্থীরা নীরব পাঠের সময় শুধু বইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে, না ঠিকঠাক পড়ছে তা শিক্ষক অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে পারবেন।

বলা যেতে পারে সরব পাঠ ও নীরব পাঠ পরস্পরের পরিপূবক। ভাষা শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে সরব পাঠ যেমন প্রয়োজন, তেমনি শিক্ষার্থীর বয়স ও যোগ্যতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীরব পাঠে তার মনোসংযোগ ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। সরব পাঠের মুখরতা ক্রমে নীরব পাঠের গভীরতার মধ্যে রূপান্তরিত হয়। অনেকগুলি বিষয় অনেক সময় ধরে পড়াশোনা করতে গেলে নীরব পাঠই সবচেয়ে বড় অবলম্বন ।

প্রকৃতি অনুযায়ী পাঠকে সরব পাঠ ও নীরব পাঠ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এছাড়া পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং কবিতার উপযুক্ত রসাস্বাদনের জন্য পাঠকে আরো কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় —

(1) চর্বনা পাঠ (Critical Study) ঃ

এমন কিছু বিষয়বস্তু থাকে (বিশেষ করে প্রবন্ধের বা আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে) যার যুক্তি, তর্ক, বিচার, বিশ্লেষণ করে তার অর্থ যথাযথ ভাবে বুঝতে হয়। এই ধরণের পাঠকে চর্বনা পাঠ বলে ।

(2) স্বাদনা পাঠ (Appreciation Study) ঃ

যে সমস্ত রচনায় (বিশেষ কবি কবিতা পাঠে) রসাস্বাদনই প্রধান অর্থাৎ প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য, শব্দ ব্যবহার, ছন্দ অলঙ্কার প্রভৃতির বিশ্লেষণ করতে বা উপলব্ধি করতে হয়, সেইসব পাঠকে স্বাদনা পাঠ বলে । এখানে একথা বলা আবশ্যক হয়ে পড়ে যে প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পক্ষে কবিতার রসাস্বাদন করা সম্ভব পর নয়। তাই এই স্তরে ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য, শব্দ-প্রয়োগের চমৎকারিত্ব, প্রকাশভঙ্গির সৌন্দর্য, বক্তব্য বিষয় কিংবা বর্ণনার মনোহারিত্ব প্রভৃতি উপভোগ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে ।

(3) ধারণা পাঠ (Comprehensive Study) ঃ

এমন কিছু বিষয় থাকে, যেগুলি পাঠ করা হয় একটা সাধরণ ধারণা পাওয়ার জন্য । এই জাতীয় পাঠে নিখুঁত বিচার-বিশ্লেষণ,কিংবা রসাস্বাদনের কোনো অবকাশ বা প্রচেষ্টা থাকে না। বলা যায় দ্রুতপাঠের মাধ্যমে লেখকের বক্তব্য সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করতে যে পাঠের আশ্রয় নেওয়া হয় তাকে ধারণা পাঠ বলে। এই পাঠকে আয়ত্তীকরণ পাঠও বলা হয়ে থাকে। সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্র, গল্প পাঠ, দ্রুত পাঠনের বিভিন্ন পুস্তক প্রভৃতি এই জাতীয় পাঠের অর্ন্তভুক্ত ।

(4) সুসংহত বা পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ (Intensive Study) ঃ

কোন রচনা বা বিষয় পড়বার সময় যখন রচনায় ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের অর্থ, বাক্যের গঠন, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, ধ্বনি - রস, ছন্দ - অলংকার প্রভৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করে পড়তে হয়, তাকে সুসংহত বা পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ বলে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক এইভাবে

পড়ালে শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা ও সঠিক জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটে।

(5) বিস্তৃত বা ব্যাপক পাঠ (Extensive Study) ঃ

পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠের ঠিক বিপরীত পাঠ বিস্তৃত বা ব্যাপক পাঠ। বলা যায় এমন কিছু রচনা বা বিষয় আছে যেগুলি খুঁটিয়ে না পড়লেও তার বিষয়বস্তু আস্বাদন করতে কোন অসুবিধা হয় না। একেই বিস্তৃত পাঠ বলে । যেমন — খবরের কাগজ, ছোটোদের বইপত্র পড়া প্রভৃতি ।

(6) অনুপূরক বা সম্পূরক পাঠ (Supplementary Study) ঃ

কোন বিষয়কে আরো বেশি করে জানার জন্য শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত অন্য কোনো বই পড়তে শিক্ষক বলেন । একেই অনুপূরক বা সম্পূরক পাঠ বলে ।

(7) সমধর্মী বা সমান্তরাল পাঠ (Collateral বা Parallel Study) ঃ

আমরা জানি, প্রত্যেকটি বইয়ের কিছু না কিছু অসম্পূর্তা থাকে । এই অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করার জন্য সমধর্মী কিছু কবিতা বা গদ্যাংশ পাঠের প্রয়োজন হয়। এই ধরনের পাঠকে সমধর্মী বা সমান্তরাল পাঠ বলা হয়। যেমন— পশুকে কেন্দ্র করে লেখা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘আদরিনী’ গল্পটি পড়তে গিয়ে শিক্ষার্থীদের শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’, তারাশংকরের ‘কালাপাহাড়’, ‘কামধেনু’, মনোজ বসুর ‘বাঘ’ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের সে বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া।

আদর্শ পঠনের বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব, পরিকল্পনা ও বিকাশের প্রণালী ঃ

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শ পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম । কারণ আদর্শ পাঠ ছাড়া পঠিত বিষয়ের অর্থ যেমন শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না, তেমনি পাঠে দক্ষতা অর্জন না করলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্য বিষয়ের অর্থ গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়। তাই আদর্শ পাঠের বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব বা গুণগুলি যাতে শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বগুলিতে দক্ষতা অর্জন করতে পারলে তবেই ভাষা শিক্ষা গ্রহণ সফল ও সার্থক হবে । এই আদর্শ পাঠের বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্বগুলি নিম্নরূপ —

(1) নির্ভুলতা (Accuracy) ঃ

পাঠ্য বিষয় নির্ভুল ও সঠিক ভাবে পাঠ করাই হলো আদর্শ পাঠের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । সরব পাঠের সময় স্পষ্ট, নির্ভুল ও ভাষাতত্ব অনুযায়ী উচ্চারণ হবে । যতিচিহ্ন ও ছন্দের উপর গুরুত্ব দিতে হবে । নীরব পাঠের ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দের উপর মনোযোগ দিতে না হলেও, যথাযথ অর্থ উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শব্দগুলির উপর সঠিক ভাবে দৃষ্টি দিতে হবে ।

(2) গতি (Speed) ঃ

গতিও আদর্শ পাঠের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য । পাঠের গতি শিক্ষার্থীদের বয়স, শ্রেণি ও মানসিকতা অনুযায়ী দ্রুত থেকে দ্রুততম হবে । কম সময়ে বিস্তৃত পাঠের অধ্যয়ন করতে হবে। তবে গতির কথা চিন্তা করে পাঠের অর্থগ্রহণ অসম্পূর্ণ হলে চলবে না। তাই পাঠের অভ্যাস (Study habit) পাঠের দক্ষতা (Study Skill), মানসিক একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়ের দ্রুত সঞ্চালন ক্ষমতা প্রয়োজনীয় ।

(3) উপলব্ধি (Comprehension) ঃ

বিষয়টি পড়ে তার শব্দ ও বাক্যের অর্থ আয়ত্তীকরণ ও উপলব্ধি করা আদর্শ পাঠের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । যে বিষয়টি পড়া হবে তার অর্ন্তনিহিত ভাব, রস, ধ্বনি, সৌন্দর্য, চেতনা, শব্দ ও বাক্য বিন্যাস, রূপনির্মিত প্রভৃতি নিবিড় ও সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে হবে ।

(4) অভিব্যক্তি (Expression) ঃ

আর্দশ পাঠের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অভিব্যক্তি । কোনো বিষয়ের সরব পাঠের সময় লেখকের যেভাব, আবেগ, অনুভূতি বিষয়টিতে থাকে, তা শিক্ষার্থীর কণ্ঠস্বর, অঙ্গভঙ্গি ও মুখভঙ্গির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। নীরব পাঠেও শিক্ষার্থীর মুখমণ্ডলে সাহিত্য রসাস্বাদনের অপূর্ব অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। তাই শিক্ষকদের নজর রাখতে হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথার্থ উপলব্ধিজাত অভিব্যক্তি প্রকাশ পাচ্ছে কিনা সেইদিকে।

এই প্রণালী বা বৈশিষ্ট্যে শিক্ষার্থী দক্ষ হয়ে উঠলে সে পঠিত ধারণাকে, যেমন সঠিক জায়গায় সরল, সরল বোধগম্যভাবে বলতে ও লিখতে পারবে তেমনি সাহিত্যের প্রতি রুচি জাগ্রত হয়ে বিভিন্ন কবিতা, গান, ছড়া, রেখাচিত্র কথোপকথন ইত্যাদির মাধ্যমে এবং বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহী হবে।

D. লিখন বা লেখা (Writing)

অন্যের কাছে মনোভাব ব্যক্ত করার মাধ্যম ভাষা। যে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার মাধ্যম এই ভাষা। বলে এবং লিখে, ভাষাকে দুইভাবেই ব্যক্ত করা যায়। যে ভাষা মুখে বলা তা মৌখিক বা কথ্য ভাষা । যে ভাষা লিখে প্রকাশ হয় তা লিখিত ভাষা। লিখন ভাষাকে স্থায়িত্ব প্রদান করে। বক্তব্যের স্বাক্ষর হল লিখন। মনোভাবকে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য লিপির উৎপত্তি । তাই লিখন লিপি আশ্রিত। লিখিত বক্তব্য অনায়াসে রক্ষিত রাখা যায় ও দূরস্থ ব্যক্তিকেও জানানো যায়। পত্র, কোনো সূচনা বা ঘটনার বিবৃতি লিখনের দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভব । সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে লিপির আবিষ্কার । উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ধ্বনি সংকেতের সৃষ্টি । এই ধ্বনি চিহ্নগুলিই লিপি, এই লিপিকে অবলম্বন করে লিখনের সৃষ্টি।

লিখন দক্ষতার উদ্দেশ্য —

লিখন মনোভাবের স্বাক্ষর, লিখনের সময় সচেতন থেকে লেখা হয়। লিখনের উদ্দেশ্য হল —

* মনোভাবকে স্থায়িত্ব দেওয়া।
* ভবিষ্যতে জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে লেখার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ।
* যুক্তিপূর্ণ (Rational) এবং প্রাসঙ্গিকতার (To the point) সঙ্গে ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন ।
* বর্ণনা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি।
* ভাষার মাধ্যমে বক্তব্যের সচেতন প্রকাশ।
* অন্যকে বোঝার ও বোঝানোর কুশলতা বৃদ্ধি।
* জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বক্তব্য পেশ করা ।
* শিক্ষার্থীদের গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি লিখে সৃজন ক্ষমতার বিকাশ সাধন ।

লিখন দক্ষতার নিয়ম ঃ

লিখন পদ্ধতি বা সুন্দর হাতের লেখার জন্য কয়েকটি নিয়ম আছে যা পালন করা শিক্ষার্থীর জন্য অতি আবশ্যক —

* লেখার সময় সঠিকভাবে কলম ধরতে হবে।
* লিখিত অক্ষরগুলি স্পষ্ট হতে হবে । যুক্তবর্ণ বা অন্যান্য বর্ণগুলি শিক্ষার্থী স্পষ্ট ভাবে লিখবে যাতে পড়তে অসুবিধা না হয়।

* সহজ সরলভাবে রেখা বিন্যাস করে লিখতে শেখা প্রয়োজনীয় ।
* অক্ষরের মধ্যে সমরূপতা রাখতে হবে। ছোটদের অনুশীলনের খাতায় এর অভ্যাস করতে হবে ।
* লেখার সময় নির্দিষ্ট ব্যবধান রক্ষা করা আবশ্যক । অক্ষর এবং পংক্তি দুটিতেই সমান ব্যবধানের দিকে নজর রাখতে হবে ।
* যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে স্পষ্ট ও সুন্দর অক্ষরে লেখার অভ্যাস করানো দরকার । শ্রুতি লেখন উপকারী হবে।
* লেখার সময় যতিচিহ্নগুলির সঠিক ব্যবহারের দিকে খেয়াল রাখতে হবে । লিখনের সময় দাড়ি, কমা, পূর্ণচ্ছেদ, অল্প বিরাম প্রভৃতি যতি চিহ্ন সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা প্রয়োজন। প্রত্যেক চিহ্নগুলির উচিত ব্যবহার জানা দরকার। বার বার লিখনে যতি চিহ্ন সম্বন্ধে ধারণা তৈরি হবে।
* মাত্রা দিয়ে অক্ষর ও শব্দ লিখতে হবে। তাতে সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়।
* লেখার সময় প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার সময় অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করতে হয় ।
* খাতার উপরে ও পাশে যথাযথ মার্জিন রাখার অভ্যাস করানো ।
* লেখার ভঙ্গিকে (Posture) ঠিক রাখতে হবে ।
* লেখার অভ্যাস রাখতে হবে। বার -বার লেখার ফলে বিষয়টির প্রতি ধারণা যেমন স্পষ্ট হয়, লেখার আলস্যও দূর হয়।

অনুলিখন, শ্রুতিলিখন, প্রতিলিপির সাহায্যে সুন্দর হাতের লেখার অভ্যাস করা যায় । অনুলিখন দেখে লেখা আর শ্রুতিলিখন শুনে শুনে লেখা। দুটোতেই লেখার অভ্যাস তৈরি হয়। ভালোভাবে লিখতে পারা একটি দক্ষতার ব্যাপার। শ্রেণিকক্ষে আলোচিত বিষয় যদি শিক্ষার্থীদের দিয়ে তাদের নিজের মতো করে লেখানো হয় তাহলে তাদের কল্পনাশক্তি, চিন্তাশক্তির বিকাশ হবে। বিষয়বস্তু যদি তাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সামগ্রী বা আশেপাশের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় তাহলে তাদের কল্পনার ডানা আরো বেশি পাখনা মেলতে পারবে, যেমন-বৃষ্টি, প্রজাপতি, মেঘ, পরী, গাছ, ফুল ইতাদি। অপরদিকে তার ব্যবহিত বস্তু, যেমন-বই-খাতা, পুতুল, প্রিয়খাবার ইত্যাদি । আবার এই লিখনের বিষয়বস্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কে উপর ভিত্তি করেও হতে পারে, যেমন— মা-বাবা, শিক্ষক, বন্ধু, সে নিজের ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য মূল্যায়ন বিধির ব্যবহার করা যায়। সুন্দর হাতের লেখার জন্য অতিরিক্ত নম্বর বা গ্রেড (A, A+, B) দেওয়া যায় । এর ফলে শিক্ষার্থীরা লিখনের ব্যাপারে আগ্রহী হবে। নিজের নিজের লিখিত বিষয়বস্তু যথাসম্ভব সুন্দর করে প্রকাশ করতে হবে। এতে শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার পরিচয় পাবেন ।

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পদ্ধতি ঃ

শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষককে সঠিকভাবে পাঠ সম্পূর্ণ করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনোযোগ, আগ্রহ, প্রেরণা প্রভৃতির বৃদ্ধি ঘটিয়ে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিকাশে সাহায্য করে থাকেন। তাই শিক্ষণ পদ্ধতিতে যুক্তিগ্রাহ্য, মনোবৈজ্ঞানিক, সামাজিক, বাস্তবিক ভিত্তির উপর জোর দিতে হয়। একজন শিক্ষক অবশ্যই বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার্থী — এই দুইয়ের কথা মাথায় রেখে শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন ও পরিচালনা করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বস্তরে ভাষা শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠ ও সঠিকভাবে পরিচালনা করতে কয়েকটি পদ্ধতি

অবলম্বন করা আবশ্যক । তাই শিক্ষকের মধ্যে শুধু বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়, বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকাও অত্যাবশ্যক। তাঁকে জানতে হয় কোন বিষয়বস্তুকে কোন পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করলে তা বেশি কার্যকরী হবে। শিক্ষাদর্শনকে অবলম্বন করে শিশু মনস্তত্ত্বকে ভিত্তি করে, শিশুর জীবন অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়। বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ —

(1) **বর্ণক্রম পদ্ধতি (Alphabetical Method), শব্দক্রম পদ্ধতি (Word Method), বাক্যক্রম পদ্ধতি (Sentence Method) ঃ**

শিশুকে পড়তে ও লিখতে শেখার জন্য অক্ষর জ্ঞানের পরিচয় করানো অপরিহার্য । অন্যথা ভাষা শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নয়। তাই এই শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় যা মনস্তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক ও শিশুকেন্দ্রিক হবে ।

(i) **বর্ণক্রম পদ্ধতি ঃ** শিশুর অক্ষর জ্ঞানের জন্য সর্বপ্রথম তাকে বর্ণের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়।প্রথমে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, তারপর যুক্তবর্ণ, এর পর মাত্রা, চিহ্ন যেমন— আ - কার, ই-কার, ঈ-কার, উ-কার ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় করানো হয় । এর সঙ্গে সঙ্গে তারা বর্ণগুলির উচ্চারণও আয়ত্ত করে। বর্ণের আকৃতি, উচ্চারণের জ্ঞান এই পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষাদানের ভিত্তি । বর্ণগুলি শেখা হয়ে গেলে শব্দ ও বাক্য আয়ত্ত করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। এইজন্য শিক্ষার্থীদের বর্ণক্রম পদ্ধতিতে বাংলা ভাষা শিক্ষা দান করা বিশেষ প্রয়োজন । এই পদ্ধতিতে বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে শেখানো যায়। শিক্ষার্থীরা অতি সহজেই স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ চিনতে পারে, পড়তে পারে ও লিখতে পারে। বর্তমান মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের শিক্ষাদান পদ্ধতির দৃষ্টিতে এই পদ্ধতিটির অসারতা প্রমাণিত হলেও এটি একটি সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি ।

(ii) **শব্দক্রম পদ্ধতি ঃ** শিক্ষার্থীর অতি পরিচিত শব্দগুলি দিয়ে এই পর্বের শুরু । সঙ্গে সঙ্গে তারা সুষ্ঠ উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে ও বানানও শিখতে থাকে। বলা হয়ে থাকে বর্ণক্রম নয় শব্দক্রম ভাষা শিক্ষাদানের সঠিক পদ্ধতি। শিক্ষার্থী তার জানা শব্দ থেকে নতুন নতুন বর্ণের লেখ্যরূপ শিক্ষা করে । দৈনন্দিন জীবনে শিশুর সমস্ত রকম কার্যকলাপ শব্দ দিয়ে ঘেরা। তাই শব্দকে কেন্দ্র করে ভাষা শিক্ষাদান। শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিশু মনস্তত্ত্বভিত্তিক । বারবার একই শব্দ বার-বার করে উচ্চারণ করানোর ফলে শিক্ষার্থীর মনে শব্দের উচ্চারণ ও শব্দের প্রতীক সম্বন্ধে সঠিক ধারণা জন্মাবে । বিভিন্ন শব্দের প্রতীক দিয়ে শিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার করতে পারলে তা শিশুর কাছে সহজ ও বোধগম্য হবে। যেমন নল, কলা, পাতা, কলম ইত্যাদি । শিশু তার নিজের পরিবেশ থেকে শব্দ চয়ন করতে পারে বলে এই পদ্ধতি আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। আবার অন্যদিকে এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পাঠে আকর্ষণ বোধ করে না। বর্ণমালা শিখতে সময় লাগায় পাঠ সহজেই ভুলে যায়।

(iii) **বাক্যক্রম পদ্ধতি ঃ** ভাষা ব্যবহারের সবথেকে সার্থক অবলম্বন হলো বাক্য । বাক্যের মধ্যে দিয়েই নিজের মনোভাব ব্যক্ত করা হয় বা অন্যের বক্তব্য গ্রহণ করা হয়। শিশু তার চাওয়া পাওয়ার কথা বাক্যের মধ্যে দিয়ে একে অপরের কাছে বলে এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। শিশুর পরিচিত জগত থেকে ছোট ছোট শব্দ সহযোগে ছোট ছোট বাক্য গঠন করে শিক্ষা দিতে হবে।

বাক্যগুলি বড় বড় হরফে লিখে প্রত্যেকটি বাক্যর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিত্র এঁকে দেওয়া হলে বা ছবি দেখানো হলো তা আরো বেশি চিত্তাকর্ষক এবং ফলপ্রসূ হবে । বর্ণ, শব্দ, বাক্য প্রত্যেকটি বিধি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে হবে ।

(2) **ধ্বনি সাম্য পদ্ধতি (Phonetic Method) ঃ**

প্রত্যেকটি বর্ণের উচ্চারণ স্থান নির্দিষ্ট । বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে উচ্চারণের সামঞ্জস্য আছে। তাই বিভিন্ন শব্দের মধ্যে ধ্বনি সাম্য লক্ষ্য করা যায়। এই সব ধ্বনি সাম্য যুক্ত শব্দগুলিকে কেন্দ্র করে ভাষা শিক্ষাদান করা যেতে পারে । শব্দগুলি শিশুর অভিজ্ঞতার ভান্ডার থেকে গ্রহণ করলে শিশুর বুঝতে সুবিধা হয়, যেমন—

দল, বল, ফল, কল, নল, চল, ছল, তল ।

কুল, ফুল, দুল, ফুল, চুল, পুল, টুল, নুন ।

এই পদ্ধতি প্রয়োগ করায় শিশুর ছন্দ, লয় ও মিল সম্পর্কে ধারণা জন্মায় । শিক্ষার্থীর অর্থবোধ যেন গৌণ হয়ে না পড়ে সেইদিকে শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে।

(3) আবৃত্তি, গল্প বলা, অভিনয় পদ্ধতি (Recitation, Story Telling, Acting Method)

আবৃত্তি শিশু চিত্তকে সহজে আকৃষ্ট করে। আবৃত্তি যদি সুষ্ঠ উচ্চারণ, ছন্দ, যতিচিহ্ন, ভাব প্রভৃতির দিকে যথাযথ খেয়াল রেখে করানো হয় তাহলে তা ভাষা শেখার জন্য বিশেষ লাভপ্রদ হবে । কবিতা বা ছড়া আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে শিশু আনন্দ লাভ করে । আর গল্পের প্রতি আকর্ষণ ছোট বড় সকলের । রূপকথা, ভয়-ভীতি, কৌতুক, চিত্রধর্মীতা, প্রভৃতি গল্পের প্রাণ। এইগুলি শিশুদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণের বিষয়। তবে গল্প বলার আকর্ষক কায়দা বা ঢং রপ্ত করতে হয়। আর গল্পগুলিকে হতে হবে শিক্ষামূলক । গল্পের বিষয়বস্তু ও আয়তন শিশুর মানসিক বয়সের উপযোগী হবে। খেয়াল রাখতে হবে শিক্ষার্থীদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার মধ্যে দিয়ে শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ যেন প্রকাশ পায়। শিশুদের পুস্তকবিহীন ও প্রাথমিক প্রস্তুতির স্তরে গল্পের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষাদান খুবই কার্যকর পদ্ধতি সিদ্ধ হয়েছে। কোন কোন কবিতা বা গদ্যাংশ এমন আছে যেগুলি অভিনয়ের মাধ্যমে পড়ালে পাঠ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে । এতে শিক্ষার্থী চোখ এবং কানের মতো ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে বলে তা শিক্ষার্থীর মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(4) আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method)

কোনো বিষয় সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে কয়েকজন মিলে পারস্পরিক মত বা ভাব বিনিময় বা কথোপকথনের যে প্রক্রিয়া তাকেই আলোচনা পদ্ধতি বলে । এটি একটি প্রাচীন পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সমান ভূমিকা থাকে । এতে শিক্ষার্থীরা নিজের স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ পায়, চিন্তাভাবনা করে কথা বলতে শেখে । তাদের আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে ।

(5) বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method) ঃ

এই পদ্ধতি বহুল প্রচলিত । এই পদ্ধতিতে শিক্ষক তার নিজের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে পরিবেশন করেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের সর্বময় ভূমিকা পালন করেন । এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের মূল বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়। তাঁর কণ্ঠস্বর, অঙ্গভঙ্গি এবং বাচনভঙ্গি আকর্ষণীয় হওয়া প্রয়োজন । এই পদ্ধতি শিক্ষকের জন্য সরল, সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয় এবং এতে নির্ধারিত সময়ে পাঠদান করা সম্ভব । এই পদ্ধতিতে কম সময়ে অনেক বেশি শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে শিক্ষা প্রদান করা যায়। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বক্তব্য শুনে খাতায় নোট করে নিতে পারে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক সক্রিয় থাকায় শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। শিক্ষক শুধু বক্তৃতা দেওয়ায় শ্রেণিকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়াটি নিরস হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক (Child Centered) নয়।

(6) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (Question-Answer Method) ঃ

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পরস্পরের মধ্যে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান, দক্ষতা অর্জন এবং আচরণের পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া হলো প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি । এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী যথেষ্ট সক্রিয় থাকে। শিক্ষক পাঠদান করে অনুভব করতে পারেন পাঠের সার্থকতা ও অগ্রগতি । এই পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে ব্যবহার করা যায় বলে পাঠের একঘেয়েমি দূর করে বৈচিত্র্য আনে। তবে এই পদ্ধতির ব্যবহারে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা বিরক্ত হয়ে পড়ে । প্রশ্ন ভীতির কারণে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কক্ষে উপস্থিতির হার

কমে যায়।

(7) প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method) ঃ

প্রকল্প পদ্ধতি শিক্ষার একটি আধুনিক পদ্ধতি । যার মধ্যে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যক্রম এবং অনুসন্ধানমূলক বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব দেয়। এই পদ্ধতিটি বাস্তববাদী দর্শনের এবং ক্রিয়াত্মক শিখন নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। জীবনের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত কোনো সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করা ও সেই সমস্যামূলক কাজ সম্পাদনের জন্য জ্ঞান অর্জন করাই হলো এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য । শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকল্প পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও চেতনাকে উৎসাহিত করে। পাঠের একঘেয়েমি দূর করে, শিক্ষার্থী হাতে কলমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বাস্তবধর্মী, উদ্দেশ্যমুখী শিক্ষা লাভ করে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর কর্ম সম্পাদনের উপর বা শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা বা Activity - র উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতির রূপায়ণে প্রথমে কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তার পরিকল্পনা, তারপর তার কর্ম সম্পাদন ও শেষে মূল্যায়ন করতে হয় ।

(8) প্রদর্শন পদ্ধতি (Demonstration Method)

প্রদর্শন পদ্ধতি সনাতন পদ্ধতি রূপে ব্যবহৃত হয়। পাঠদানের যে পদ্ধতিতে পরিকল্পনা মতো প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা উপকরণ ব্যবহার করে হাতে কলমে পরীক্ষা - নিরীক্ষার মাধ্যমে বা ব্যবহারিক ভাবে কোনো ঘটনা অথবা বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের শিখন ফল অর্জনের চেষ্টা করা হয় তাকে শিক্ষণ - শিখন কার্যক্রমে প্রদর্শন পদ্ধতি বলে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে কোনো কিছু প্রদর্শন, বর্ণনাকরণ এবং অনুশীলনের সুযোগ বর্তমান। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সাধারণত নিষ্ক্রিয় শ্রোতা বা দর্শক রূপে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকলেও পাঠ্য বিষয় অনুধাবন করতে উৎসাহ বোধ করে। তবে এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নিজে হাতে কাজ করার সুযোগ কম থাকায় ব্যবহারিক দক্ষতা গড়ে উঠতে পারে না ।

(9) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পদ্ধতি (Information and Communication Technology)

শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান যুগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি । এটি এমন একটি শিখন পদ্ধতি যার মাধ্যমে দৃশ্য, শ্রাব্য এবং দৃশ্য - শ্রাব্য উভয়ের মধ্যে দিয়ে কোনো বিমূর্ত ধারণাকে মূর্ত রূপে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা যায় । তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ও বৈচিত্র্য এনেছে। কোনো তথ্যের উৎপত্তি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সঞ্চালনের জন্য এর ব্যবহার হয়ে থাকে। কম্পিউটার, রেডিও, টেলিভিশন, ফ্যাক্স, মোবাইল, ল্যাপটপ, অডিও - ভিডিও, স্যাটলাইট সিটেম, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, য়ুটিউব, মডেম, হোয়াটস এ্যাপ ইত্যাদি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিমূলক উপকরণ শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এনেছে। এইগুলির ব্যবহারে কোনো জটিল বিষয় অতি সহজে, সুচারুরূপে উপস্থাপন করা যায়। ফলে শিক্ষার্থীদের বুঝতে সুবিধা হয়। এর ব্যবহারে যে কোনো বিষয়ের প্রতিকৃতি, প্রতিচ্ছবি, প্রতিরূপ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা যায় ।

ভাষা শিক্ষাদানের সমস্যার সমাধান ঃ

আমাদের দেশে ভাষা শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সব সমস্যা ও তার সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করতে হবে —

1. উপযুক্ত পরিবেশের অভাব ঃ

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই পড়াশোনার মত পরিবেশ নেই। ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র নিতান্তই সামান্য। পানীয় জলের ব্যবস্থার

জন্য জলের কল অথবা টিউবওয়েলের অভাব দেখা যায়।

2. **অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রণালী ঃ**

শিক্ষা প্রণালী সর্বদা বৈজ্ঞানিক, শিশুমনস্তত্ত্বভিত্তিক হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রাচীন, অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রণালীতে পঠন-পাঠন হয়। আধুনিক শিক্ষা- জগতের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির যেন কোন সম্পর্ক নেই। তাই শিক্ষক ও অভিভাবক দুজনকেই এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে ।

3. **যোগ্য শিক্ষকের অভাব ঃ**

প্রাথমিক শিক্ষকদের অধিকাংশই ট্রেনিং প্রাপ্ত নন। শিক্ষকের উপরও পঠন-পাঠন নির্ভর করে। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, শিক্ষকের বাচনভঙ্গি শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষকই তাদের আদর্শ। তাকেই শিক্ষার্থী অনুকরণ করে। শিক্ষকের অকারণ ক্রোধপ্রকাশ শিক্ষার্থীকে পড়াশোনায় বিমুখ করে তোলে। যোগ্য শিক্ষকের গুণগুলি শিক্ষকের মধ্যে থাকতে হবে।

4. **শিক্ষা সহায়ক উপকরণের অভাব ঃ**

আধুনিক শিক্ষাদর্শন ও মনোবিজ্ঞানে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ অপরিহার্য। শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি মনে প্রত্যক্ষ আবেদন (Direct Appeal) সৃষ্টি করে, ধারণাকে পূর্ণ করে অভিজ্ঞতাকে বাস্তবভিত্তিক করে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণকে কার্যকর করতে গেলে ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষককে কিছু কিছু শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। কারণ শুধুমাত্র মৌখিক শিক্ষণ (Oral Teaching) দ্বারা শ্রেণি শিক্ষণ পূর্ণতা পায় না। মৌখিক শিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে নানারকম সহায়ক সামগ্রির (Teaching Aida) ব্যবহারও প্রয়োজনীয়। এতে বিমূর্ত ধারণা মূর্তভাবে উপস্থাপিত হয়। ব্ল্যাকবোর্ড, চার্ট, মডেল, রেখাচিত্র, স্মার্ট বোর্ড, ভিডিও ক্যাসেট, সিডি, টেলিভিশন, ম্যাপ, গ্লোব, ছবি, সংবাদপত্র প্রভৃতি শ্রেণিকক্ষের শিক্ষাকে আনন্দময় ও আকর্ষণীয় করে তোলে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা - সহায়ক উপকরণগুলির ব্যবহারে বিশেষ সমস্যা দেখা যায়। সরকার, কর্তৃপক্ষ, প্রধান শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক প্রভৃতি কারো এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ নেই। অর্থের অভাবেও উপকরণগুলি সংগ্রহ করা যায় না। তাই এদিকে সবাইকে আকৃষ্ট করতে হবে।

5. **সচেতনতা ও ধৈর্যের অভাব ঃ**

কোন কিছু শিখতে হলে, জানতে হলে সচেতন ভাবে ও ধৈর্য সহকারে শিক্ষকের কথা শুনতে ও জানতে হয়। ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে মনোযোগের অভাব ঘটে। এই সমস্যা থেকে বেরোতে শিক্ষার্থীর ধৈর্য ও সচেতনতা ফিরিয়ে আনতে, শিক্ষাকে আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তুলতে বিভিন্ন দক্ষতা ও পদ্ধতিকে অবলম্বন করতে হবে।

6. **পাঠের অতিরিক্ত কার্যাবলী ঃ**

আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতিতে পাঠের অতিরিক্ত কার্যাবলীর (Extra Cluricular Activities) উপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মননশীলতা, সৃজনশীলতা, কল্পনাশক্তি, সাহিত্যানুরাগ প্রভৃতি বিকাশে এই কার্যাবলীর প্রয়োজন আছে। এই রকম কার্যাবলীর মধ্যে আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক, বক্তব্য, সংগীত, চিত্রাঙ্কণ, দেওয়াল পত্রিকা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রভৃতি উল্লেখনীয়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এইসব কার্যাবলীর একান্ত অভাব দেখা যায়। বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনায় সাহিত্যানুশীলনের এইসব কর্মসূচিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

7. বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের অভাব ঃ

অনেক বিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার নেই। থাকলেও তাতে আবশ্যকতা অনুযায়ী বই নেই। তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নিজের চাহিদা পুরো করতে পারে না।

8. উচ্চারণে আঞ্চলিতার দোষ, মিশ্র ভাষার প্রয়োগ ঃ

পঠন-পাঠনে উচ্চারণ স্পষ্টভাবে না করলে ভাষা বিশুদ্ধতা হারিয়ে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। শিশু তার প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে যদি ঠিক-ঠিক উচ্চারণ করতে না পারে, নিজের বাড়ির বা আশে-পাশের মৌখিক ভাষার উচ্চারণ স্কুলের পরিবেশেও ব্যবহার করে তাহলে তার শিক্ষায় ত্রুটি থেকে যাবে। বানানেও ভুল হবে। সাধু চলিত মিলিয়ে কথা বললেও তা ব্যাকরণগত দিক দিয়ে সঠিক নয়, তেমনি শুনতেও খুব খারাপ লাগে। তাই শিক্ষককে এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ সহকারে ধৈর্য ধরে এগোতে হবে ।

9. ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সমস্যা ঃ

ব্যাকরণ একটি শুষ্ক, নীরস, জটিল বিষয়। সহজে শিক্ষার্থীরা এর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। তাই প্রায়ই দেখা যায় ব্যাকরণ পাঠে শিক্ষার্থীর অনিচ্ছাই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু একে ছাড়া ভাষা শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না। তাই বিষয়টিকে আকর্ষণীয় ও মনোরম করে তুলতে এর পাঠ্যক্রম, ভাষা শিক্ষার স্তর, শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা, বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক ভাবে নির্ধারণ করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, নির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রভৃতির সাহায্যে ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যেতে পারে।

10. শিখন পরিকল্পনা ঃ

প্রচলিত শ্রেণি-শিক্ষায় শিখন পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। কারণ শিখন পরিকল্পনা না থাকলে পাঠদান লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। শিক্ষকের প্রস্তুতির জন্য শিখন পরিকল্পনা প্রয়োজন। শিক্ষক, শিক্ষার্থীর স্তর অনুযায়ী শিখন পরিকল্পনা করে পাঠদান করলে তা মনোবিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদান হবে। শিখন পরিকল্পনার ফলে শিক্ষক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শ্রেণিতে তাঁর পাঠ দিতে পারেন। এর ফলে শ্রেণির পরিবেশ অত্যন্ত প্রাণবন্ত থাকে।

11. উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতির নির্বাচন ঃ

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষা পদ্ধতির বিভিন্নতা দেখা যায়। কোথায় কোন পদ্ধতিটি অবলম্বন করলে শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়টি সহজ, সরল, আকর্ষণীয় ও মনে রাখার যোগ্য হবে সেটির সঠিক নির্বাচন করতে হবে।

সারাংশ ঃ

ভাষার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক জন্মলগ্ন থেকে। একে অপরের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করতে, একে অন্যের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে ভাষার প্রয়োজন হয়। এই ভাব প্রকাশ বা যোগাযোগ স্থাপন হয় কয়েকটি দক্ষতার দ্বারা - শ্রবণ, কথন, পঠন এবং লিখন । এই দক্ষতাগুলি বিভিন্ন স্তরে বা পর্যায়ে শিশুর মধ্যে জন্ম নেয়। ভাষা শিক্ষণে বা ভাষাকে আয়ত্ত করতে হলে এই সকল দক্ষতায় দক্ষ হওয়া আবশ্যক। কোনো বিষয় যখন শিশু ভাল করে বুঝবে, শুনবে, সেই বিষয়কে সুন্দর ভাবে বলতে পারবে, পড়তে পারবে এবং লিখতে পারবে তখনই শিক্ষাদান সার্থক হবে। এই পর্যায়ে কোনো স্থানের বিবরণ, কোনো অনুষ্ঠানের কথা, নিজের অভিজ্ঞতা, নিজের প্রিয়জনদের কথা, দু-চার লাইন কবিতা

সাবলীল ভঙ্গিতে সহজ - সরল ভাষায় লেখার জন্য শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও তাদের হাতে তুলে দিতে হবে ছোটদের নানা বই ও পত্র-পত্রিকা। নির্ভুল শব্দ ও তার বানান, স্পষ্ট উচ্চারিত শব্দ, সুন্দর হাতের লেখা, আঞ্চলিক ভাষা পরিহার, যতি চিহ্ন, মাত্রা ইত্যাদির সঠিক প্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এইসব দক্ষতাগুলির সঠিক বিকাশে, সঠিক শিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। প্রারম্ভিক স্তরে বর্ণক্রম, শব্দক্রম, বাক্যক্রম, ধ্বনি সাম্য, ছড়া - আবৃত্তি অভিনয় পদ্ধতির ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মত ও মনোবিজ্ঞান সম্মত হবে। এরপর অন্যান্য স্তরে বিষয়বস্তু পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী ও শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্বকে খেয়াল করে উপযুক্ত দক্ষতা অবলম্বন করে শিক্ষার্থীদের সহজ, সরল আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষাদান করা শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য । বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার শ্রেণিকক্ষ সঞ্চালনে বেশি প্রচলিত এবং বিভিন্ন রূপে এটি কার্যকরী।

অনুশীলনী

1. শিশুর প্রারম্ভিক স্তরে ভাষার প্রতি দক্ষতা কীভাবে অর্জন করে ?
2. শ্রবণের প্রকার এবং শ্রবণ দক্ষতা বিকশিত করার উপায়গুলি বর্ণনা করো ।
3. বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনে শিক্ষকের ভূমিকা কী ? আলোচনা করো ।
4. সরব পাঠের উপযোগিতা ও অসুবিধাগুলি বর্ণনা করো।
5. শ্রেণিকক্ষে কবিতা পড়ানো হেতু কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে ?
6. বর্তমান শিক্ষাদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় —আলোচনা করো।
7. আদর্শ পঠনের বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্বগুলি সম্বন্ধে লেখো ।
8. সুন্দর হাতের লেখার জন্য কোন কোন নিয়ম মেনে চলা উচিত বলে তুমি মনে করো ?
9. নীরব পাঠের অসুবিধাগুলি কী কী ?
10. ভাষা শিক্ষা দানে যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হয়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করো ।
11. **টীকা লেখো ঃ**

    (A) কথন দক্ষতার উদ্দেশ্য

    (B) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

    (C) স্বাদনা পাঠ

    (D) বর্ণক্রম পদ্ধতি

✪

একক - 4

সাহিত্য শিক্ষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা

* ভূমিকা
* উদ্দেশ্য
* সাহিত্য শিক্ষা - পদ্য সাহিত্য
  গদ্য সাহিত্য
  রেখাচিত্র
  প্রতিবেদন
  সাহিত্য শিক্ষার নিয়মাবলী
* ব্যাকরণ শিক্ষা - ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
  ব্যাকরণ শিক্ষার নিয়মাবলী
  ব্যাকরণ শিক্ষার পদ্ধতি
* সারাংশ
* অনুশীলনী

‘হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন’

— মাইকেল মধুসূদন দত্ত

একক — 4

সাহিত্য শিক্ষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা

ভূমিকা ঃ

সাহিত্য শিল্পের এমন একটি অংশ যেখানে শিল্পীর বুদ্ধিসত্তার আঁচ পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক মহাজাগতিক চিন্তা, চেতনা, অনুভব, সৌন্দর্য এবং লেখকের বাস্তব জীবনের অনুভূতি হচ্ছে সাহিত্য । সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের ও ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলাই সাহিত্যের কাজ ।"

ভারতীয় আর্যভাষায় বিভিন্ন স্তর পার হয়ে বাংলা ভাষার যখন জন্ম হয়-সাহিত্যের উদ্ভবও তখন থেকেই । বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদ বা চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। এখান থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত সাহিত্যে কাব্যধারাই প্রচলিত ছিল। এই বাংলা কাব্যধারা ধীরে-ধীরে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, যেমন— ছড়া, কবিতা, গীতিকবিতা, সনেট, গাথাকবিতা, মহাকাব্য, গদ্য কবিতা, কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, ব্যঙ্গকবিতা, নীতিকাব্য, পত্রকাব্য প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ থেকে গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব। শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিতগণের প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সূচনা। এরপর বাংলা গদ্যধারাও নানারূপে বিকশিত হয়ে গদ্য সাহিত্যের উন্নতি সাধন করে — নাটক, যাত্রা, রূপকথা, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও রচনা, ভ্রমণকাহিনী, পত্রসাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, রসসাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে।

তাই বলা যায় বাংলা ভাষায় প্রথমে পদ্য এবং পরে গদ্যকে আশ্রয় করে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এই সাহিত্যসৃষ্টিকে সুন্দর ও সুগঠিত করে ব্যাকরণসম্মত ভাষা। তাই সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের জ্ঞান আবশ্যক ।

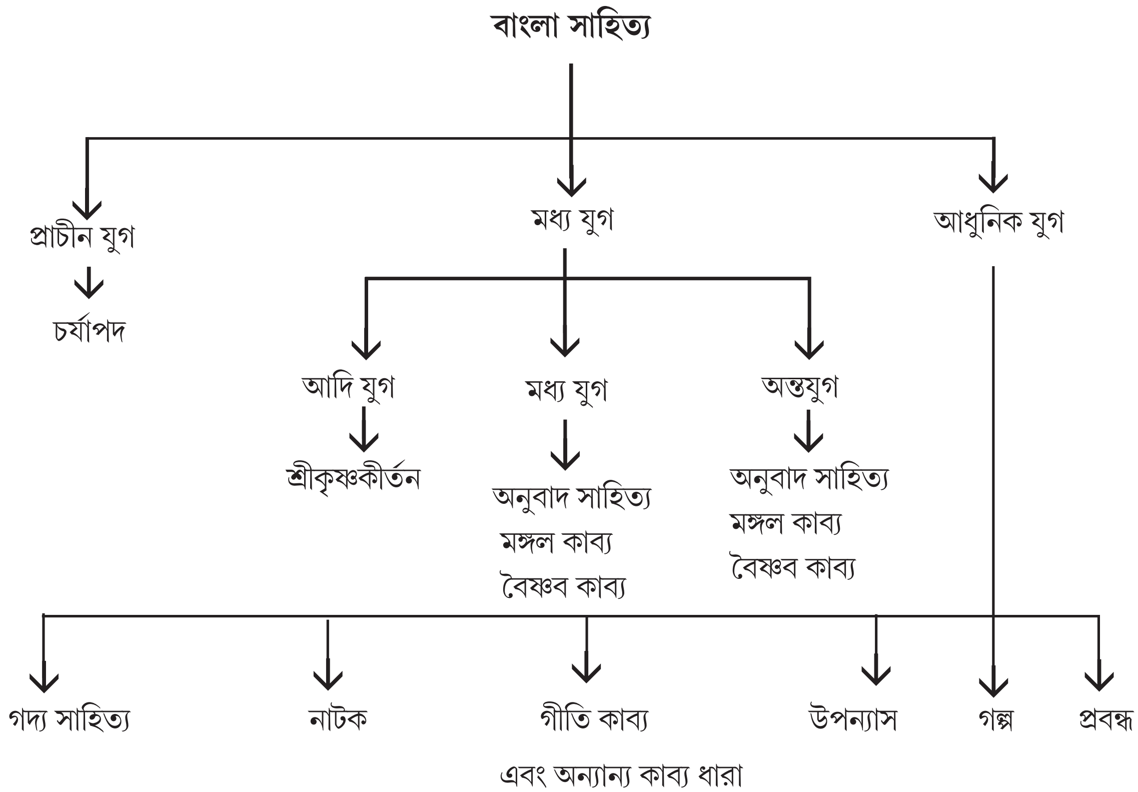

উদ্দেশ্য ঃ

* সাহিত্য ও ব্যাকরণের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে যুক্তিসম্মত এবং সহজ ও সরল ভাবে শেখানো ।
* সাহিত্য ও ব্যাকরণের সম্বন্ধকে পরিস্ফুট করা ।
* শিক্ষার্থী যদি সঠিকভাবে বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণের জ্ঞান লাভ করে তাহলে তার কল্পনাশীলতা, সৃজনশীলতা ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায় ।
* বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণে দক্ষতা লাভ করলে দেশি ও বিদেশি ভাষা শেখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
* বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর নিজস্ব ধারণা গঠন করা এবং নিজেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুলে ধরার ক্ষমতা অর্জন করা ।

সাহিত্য শিক্ষা

সাহিত্য ধারার সাধারণ পরিচয় ঃ

বাংলা সাহিত্যের সম্যক্ পরিচয় দিতে হলে প্রথমেই একটা কথা বলা ভাল যে কোন ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির সূত্রপাত কবিতাতে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত চর্যাপদ থেকে এই সাহিত্যের যাত্রা শুরু ।একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের সাহিত্য চর্যাপদ সকলের বোধগম্য ছিল না । এই পদগুলিতে বৌদ্ধ-তন্ত্র সাধনার গোপন কথা বলা হয়েছে। চর্যাপদের যুগ পার হয়ে বাংলা সাহিত্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্যের যুগে প্রবেশ করলো। বড়ু চন্ডীদাস রচিত ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’র রসাস্বাদন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য করেছেন। বিভিন্ন দেব-দেবী নিয়ে রচিত মঙ্গল কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন ইত্যাদি । অনুবাদ সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য নাম মালাধর বসু যিনি ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ রচনা করেন যা ভাগবতের অনুবাদ । এই সময়েই অনুবাদ হয় রামায়ণ ও মহাভারত। বাংলা সাহিত্যে অন্যতম একটি বিভাগ বৈষ্ণব সাহিত্য । বিভিন্ন কবিদের দ্বারা রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদে সমৃদ্ধ সাহিত্যের এই শাখাটি । মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যর আবির্ভাবের পর আমরা পেলাম জীবনীকাব্য যা আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । সময় ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো। পাঁচালী, কবিগান, আখড়াই ইত্যাদি পার হয়ে 1801 খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাহিত্য পেলো বাংলা গদ্য। বাংলা সাহিত্যের এক নূতন ধারা। বাংলা সাহিত্যের পাঠক পরিচিত হল উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদির সঙ্গে ।

(A) পদ্য সাহিত্য ঃ বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পদ্য সাহিত্যেও এল নতুনত্ব । লেখা হতে থাকলো বিভিন্ন ধরনের কাব্য, মহাকাব্য, গাথা কাব্য, গীতিকাব্য ইত্যাদি। এখানে পদ্য সাহিত্যের কয়েকটি শাখার সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো —

(i) **কবিতা ঃ**

কয়েকটি শব্দ পাশাপাশি লিখলেই তা কবিতা হয় না। শব্দগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ, শ্রুতি মধুরতা ইত্যাদির প্রয়োজন। ছন্দের বন্ধন একসময়ে কবিতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল । কিন্তু বর্তমানে আমরা কবিতাকে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি — গদ্য কবিতা ও পদ্য কবিতা। গদ্য কবিতার জন্য ‘মিল মিলানো’ ছন্দের প্রয়োজন নেই । তবে গদ্য কবিতা সঠিকভাবে পাঠ করলে এর মধ্যে লুক্কায়িত একটি ছন্দের আভাস পাওয়া যায়।

কবিতা সাহিত্যের এমন একটি শাখা যেখানে স্বল্প কথায় কবি অনেক কিছু ব্যক্ত করেন। অরূপকে রূপের মধ্যে ধরা, অমূর্তকে মূর্ত করে

তোলাই কবির কাজ। এককথায় বলা যেতে পারে কবিতা বিন্দুতে সিন্ধুর দর্শন। কবিতার আকার দুই পংক্তির হতে পারে আবার দুইশত পংক্তিরও হতে পারে। কবি শব্দের সাহায্যে ছবি তৈরি করে তাকেই নিজের রচনায় সাকার করেন। একটি ছোট্ট উদাহরণে এটি স্পষ্ট করা যেতে পারে—

"আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে ।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠক সহজেই বোঝেন ছোট্ট একটি নদী ঘুরে ঘুরে বয়ে যায় কিন্তু বৈশাখ মাস এলে সে শুকিয়ে যায়। 'হাঁটু জল' শব্দটি সেই অর্থেই ব্যবহৃত। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে এইরকম ছোট্ট ছোট্ট দৃষ্টান্তের সাহায্যে সহজেই বিষয়টি বোঝাতে পারেন। কবিতায় বিষয়বস্তুও অনেক কিছু হতে পারে। শস্য রিক্ত প্রান্তর ও অঘ্রাণের ধানের ক্ষেত দুই বিষয়েই কবিতা লেখা যেতে পারে । সরব পাঠ, কবিতায় একটি বিশেষ দিক । তাই শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনান তাহলে কবিতা শিক্ষা অনেক বেশি প্রভাবশালী হতে পারে। এটি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাতেও আছে। একটি সহজপাঠ্য কবিতায় কয়েকটি ছত্র এখানে উল্লেখ করা হলো —

"কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি
বোঝাই করা কলসী হাঁড়ি ।
গাড়ি চালায় বংশীবদন
সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন,
হাট বসেছে শুক্রবারে
বক্সীগঞ্জে পদ্মা পারে ।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ii) ছড়া ঃ

ছড়া বাংলাদেশের সামাজিক জীবনের অনেকখানি জুড়ে আছে। ছড়ার মধ্যে প্রকাশ পায় এমন সহজ সরল কিছু যা শিশুমনকে দোলা দেয়। শিশুদের হাসি, কান্না, খাওয়া, ঘুমানো ইত্যাদি সব কিছু, নিয়ে মায়েরা ছড়া শোনাতে অভ্যস্ত এবং নিপুণ। তাই বলা যেতে পারে ছড়ায় প্রকাশ পায় মায়ের স্নেহ, কোমল-স্পর্শের মাতৃমাধুরী। শিশুদের ভাষা সাহিত্য শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ছড়া শোনানো অত্যন্ত কার্যকরী সিদ্ধ হতে পারে। বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বসম্মত উপায়ে ছড়াগুলিকে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারলে ভাষাশিক্ষা শিশুদের পক্ষে সহজ, সরল, আকর্ষক এবং সার্থক হবে। একেবারে অবোধ শিশুদের ছড়ার প্রকৃতি আলাদা । কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের জন্য ছড়া একটু ভিন্ন হয়। তেমনিই একটি ছড়ার কয়েকটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত হলো —

"হাঁস ছিলো সজারু ও ব্যাকরণ মানি না,
হয়ে গেলো, 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না,
বক কহে কচ্ছপে 'বাহবা কি ফুর্তি !'
অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি ।"

— সুকুমার রায়

(iii) গীতিকবিতা ঃ

গীতিকবিতা বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। গীতিকবিতায় কবির মনের আবেগ, উচ্ছ্বাস, অনুভূতি, আকুলতা — গীতময় ছন্দে পুষ্পিত হয়। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুরণ যার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাই গীতিকবিতা। আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলী বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা। আধুনিক যুগে মাইকেল মধুসূদন এই ধারার সূচনা করলেও বিহারীলাল চক্রবর্তী এর সার্থক কবি। গীতিকবিতার বিষয় প্রেম, প্রকৃতি, দেশাত্মবোধ, ভক্তি প্রভৃতি হতে পারে।

"হিমাদ্রি শিখর পরে আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য তপোবনে !
বিকচ নয়নে চেয়ে হাসিছে দুধের মেয়ে,
তামসী-তরুণ-উষা কুমারীরতন।"

— বিহারীলাল চক্রবর্তী 'সাধের আসন'

(iv) সনেট ঃ ইংরেজী সাহিত্যের এই রচনারীতি বাংলা সাহিত্যে এনেছিলেন মাইকেল মধুসূদন। চোদ্দ লাইনের এই কবিতাকে তিনি বলেছিলেন চতুর্দ্দশপদী কবিতা। আট এবং ছয় মাত্রায় ছন্দে সনেট রচিত হয় প্রথম আটটি ছত্রক 'অষ্টক' এবং পরের ছয়টি ছত্রক 'ষষ্টক' নামে পরিচিত । অষ্টকের মধ্যে কবির ভাবকল্পনা রূপ ধারণ করে, যার বিস্তৃতি, ব্যাখ্যা ও পরিণতি ঘটে ষষ্টকে। মাইকেল মধুসূদনের সনেটগুলি আজও সমানভাবে জনপ্রিয় ।

"মহাভারতের কথা অমৃত - সমান ।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবাণ্ ।।'

– মধুসূদন দত্ত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (কাশীরাম দাস)

(v) মহাকাব্য ঃ

মহাকাব্য আয়তনে দীর্ঘ হয়। তাই পাঠ্যপুস্তকে এর বিশেষ কিছু অংশই স্থান পায়। গম্ভীর বীরত্বব্যঞ্জক বিষয়ই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু। মহাকাব্য দুই প্রকারের । প্রথমটি ক্লাসিক বা ধ্রুপদী মহাকাব্য — যেমন হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' আর সংস্কৃতে রচিত বাল্মীকির রামায়ণ ও বেদব্যাসের মহাভারত । আর এক ধরনের মহাকাব্য যা আধুনিক যুগের সৃষ্টি — যেমন মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার কাব্য', নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', প্রভাস ইত্যাদি । এগুলিকে বলা হয় সাহিত্যিক মহাকাব্য বা Literary Epic ।

"সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর - চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ?"

— মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ কাব্য'

(vi) গাথা কবিতা ঃ

যে কবিতায় কোন কাহিনি বা ঘটনাকে কাব্যরূপ দেওয়া হয় অর্থাৎ কবিতায় আখ্যান যখন প্রধান স্থান গ্রহণ করে তখন তাকে গাথা কবিতা বলা হয়। গাথা কবিতা আগে নাচ ও গানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা হত । এই সূত্র ধরে বলা যেতে পারে 'মৈমনসিংহ গীতিকা', 'গোপীচাঁদের গীত' এগুলি গাথা কবিতা বা গাথা কাব্য । রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনি'র কবিতাগুলি আখ্যানমূলক কবিতা অর্থাৎ গাথা কবিতার সমগোত্রীয়।

"তুমি হও গহীন গাঙ
আমি ডুইব্যা মরি !"

— 'ময়মনসিংহ গীতিকা'

(vii) নীতিকবিতা ঃ

সমাজ সংস্কার, ধর্মসংস্কার, চরিত্রগঠন, ভালো-মন্দের জ্ঞানদান ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয় যেসব কবিতায়, তাকে আমরা নীতি কবিতা বলতে পারি । কবি - সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্য আদর্শ মানুষ গড়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে উন্নত করা । প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে নীতি - উপদেশমূলক কবিতা পাঠ্য থাকে শিশুমনকে প্রভাবিত করার জন্য। এইসব কবিতা যদি তাদের আবৃত্তি করে শোনানো যায় তবে তারা নিশ্চয়ই এতে উদ্বুদ্ধ হবে। রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা', রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীতিকুসুমাঞ্জলি' নীতি কবিতার নিদর্শন ।

"কেরোসিন - শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে'।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা;
কেরোসিন বলি উঠে, 'এস মোর দাদা'।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কণিকা'

(viii) ব্যঙ্গকবিতা ঃ

যে কবিতায় জীবনের ত্রুটি ও অসঙ্গতি প্রকাশ পায় তাকে ব্যঙ্গ কবিতা বলে। আবার কখনও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, আক্রমণ ইত্যাদির মাধ্যমে যেসব কবিতা লেখা হয় তাকে ব্যঙ্গ কবিতা বলা হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট', 'দুরন্ত আশা', ঈশ্বর গুপ্তের 'বিধবা বিবাহ' কবিতা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হাসির গান' প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে । সজনীকান্ত দাশ সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' ও কুমারেশ ঘোষের 'যষ্ঠি মধু' পত্রিকা ব্যঙ্গ কবিতার জন্য খ্যাতিলাভ করে।

"পুরুষরা সব শুনছে ব'সে,
মেয়েরা আসর জম্‌কাচ্ছে;
গাচ্ছে এমনি তালকানা যে,
শুনে তা' পীলে চম্‌কাচ্ছে ।"

— দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'হাসির গান'

(ix) পত্রকাব্য ঃ

পত্রকাব্য বাংলা সাহিত্যের কবিতার ধারায় এক অমূল্য সংযোজন । পত্রের আকারে লেখা কবিতাকে পত্রকাব্য বলে। এই শ্রেণির কবিতায় নায়ক - নায়িকা পরস্পরের জন্য কবিতার মাধ্যমে পত্র লেখে। রোমান কবি ওভিদ এর জনক । ওভিদের অনুসরণে মাইকেল মধুসূদন বাংলা ভাষায় 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের মাধ্যমে প্রথম পত্রকাব্যের সূচনা করেন। বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে আখ্যান ভাগ, চরিত্র - চিত্রণ, ভাব - ব্যঞ্জনা ইত্যাদি সুন্দরভাবে কাব্যের আকারে পরিস্ফুট হয়।

"বন - নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র ! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে না অভাগী ?"

— মধুসূদন দত্ত 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা)

(B) গদ্যসাহিত্য ঃ

1801 খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন মোড় এলো । বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব হলো। গদ্য সাহিত্যের সূচনার পরেই আমরা পেলাম উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ নাটক, পত্রসাহিত্য ইত্যাদি।

(i) উপন্যাস ঃ

উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে। উপন্যাসে লেখকের জীবনদর্শন ও অনুভূতির কথা বিভিন্ন পাত্র - পাত্রীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এতে একটি সুসংবদ্ধ কাহিনী থাকে। অনেক সময়ে বিখ্যাত উপন্যাসিকদের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের কিছু অংশ তুলে ধরা হয় পাঠ্যপুস্তকে । বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস বাংলায় রচিত হয়েছে- সামাজিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, দেশাত্মবোধক উপন্যাস, মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, গোয়েন্দা উপন্যাস প্রভৃতি। বাংলায় প্রথম সার্থক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (1865)। প্রকৃতপক্ষে এইটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস । এরপর সাহিত্যের এই ধারায় যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা - রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, রমেশচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, শরদিন্দু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, আশাপূর্ণাদেবী, মহাশ্বেতা দেবী, আশলতা সিংহ, নবনীতা দেবসেন প্রমুখ ।

(ii) ছোটগল্প ঃ

ছোটগল্প সাহিত্যের নবীনতম শাখা । ঊনবিংশ শতাব্দ দ্বিতীয়ার্ধে এর জন্ম। ছোটগল্পের কাহিনীর মধ্যে লেখকের একটি বিশেষ ভাবকল্পনা বা চিন্তাধারা ফুটে ওঠে। গল্পের ঘটনাটি এমনভাবে বিন্যস্ত হবে যাতে পাঠকের মনে আগাগোড়া একটি উৎকণ্ঠা বজায় থাকে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় বর্ণিত ছোটগল্পের সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যেতে পারে —

"ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি, প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারটি অশ্রুজল ।

নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা

নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।

অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে

শেষ হয়ে হইল না শেষ ।”

বাঙালির গল্প শোনার প্রবণতা শৈশব থেকেই থাকে । তাই সাহিত্যের এই শাখাটি একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ শাখায় পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের জনক । তাঁর পথ ধরে চলেই বাংলা ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যের দরবারে অগ্রণীর ভূমিকায় । ছোটগল্প নিরন্তর পরীক্ষা - নিরীক্ষায় ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। আজকের গল্পের বিষয়বস্তুও একেবারে আধুনিক যুগের উপযোগী । রবীন্দ্রনাথের ‘কাবুলিওয়ালা’, ছুটি-র মত গল্পও যেমন আছে যা ছোটদের প্রিয়, তেমনি ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘অপরিচিতা’, ‘হৈমন্তী’র মত কাহিনিতে কবি নারী জাগরণের কথাও বলেছেন। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প লেখকের সংখ্যা অনেক । রবীন্দ্রনাথের পর শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সুবোধ ঘোষ, প্রফুল্ল রায় প্রমুখেরা এই শাখাটি সমৃদ্ধ করেছেন। একেবারে আধুনিক কালে সায়ন্তনী পতিতুন্ড, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, রাজশ্রী বসু অধিকারী প্রভৃতিরা বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র ।

(iii) প্রবন্ধ ঃ

গদ্য সাহিত্যের এই শাখাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । প্রবন্ধ শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন। প্রাবন্ধিক কোন বিশেষ তত্ত্ব বা তথ্যকে নিজের রচনায় প্রকাশ করেন। সেখানে কোন আবেগ বা উচ্ছ্বাসের স্থান থাকে না, তাকেই বলা হয় উন্নত ধরনের প্রবন্ধ। বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে যে সব গদ্যাংশগুলি সংকলিত থাকে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রবন্ধ শ্রেণির রচনা। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত প্রবন্ধেও বিষয়বস্তুর প্রকারভেদ আছে — বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক প্রবন্ধ, রাজনৈতিক প্রবন্ধ ইত্যাদি । বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিকের নাম — বঙ্কিমচন্দ্র (কমলাকান্তের দপ্তর), অক্ষয়কুমার দত্ত (ভূগোল), বিদ্যাসাগর . (প্রভাবতী সম্ভাষণ), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (বিবিধ প্রবন্ধ), রবীন্দ্রনাথ (কালান্তর) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (জিজ্ঞাসা), প্রমথ চৌধুরী (প্রবন্ধ সংগ্রহ) প্রমুখ ।

(iv) নাটক ঃ

নাটককে বলা হয় দৃশ্যকাব্য। নাটকে নাট্যকার সরাসরি পাঠক - দর্শকের সঙ্গে কথা বলেন। ঔপন্যাসিক যেমন কাহিনির মাঝখানে নিজের কোন মন্তব্য করতে পারেন, নাট্যকারের সে সুযোগ নেই। নাটকের প্রধান বিষয় সংলাপ, কেন না সংলাপের মাধ্যমেই আমরা চরিত্র ও কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হই। নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য এতে উপকাহিনিও থাকে। এছাড়া নাট্যসমালোচকরা তিনটি ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন — সময়ের ঐক্য, স্থানের ঐক্য, ঘটনার ঐক্য। যেহেতু ঘটনার ঐক্যর উপর নাট্যকারেরা বিশেষ জোর দেন, তাই নাটকীয়তাই হলো নাটকের প্রাণ। নাটকীয়তা অনুযায়ী নাটককে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় — প্রারম্ভ (Exposition), প্রবাহ (Growth of action), উৎকর্ষ (Climax), গ্রন্থি মোচন (Falling action) এবং উপসংহার (catastrophe)। আবার একাঙ্ক নাটক মাত্র একটি অঙ্কেই সম্পূর্ণ হয়। মন্মথ রায়ের ‘মুক্তির ডাক’ বাংলা সাহিত্যের প্রথম একাঙ্ক নাটক। বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন বিখ্যাত নাট্যকার - মাইকেল মধুসূদন দত্ত (কৃষ্ণকুমারী), দীনবন্ধু মিত্র (নীলদর্পন), গিরিশচন্দ্র (জনা), রবীন্দ্রনাথ (বিসর্জন), দ্বিজেন্দ্রলাল (চন্দ্রগুপ্ত), এবং আধুনিক কালের বাদল সরকাব (এবং ইন্দ্রজিৎ), উৎপল

দত্ত (টিনের তলোয়ার), মনোজ মিত্র (সাজানো বাগান), প্রমুখেরা ।

এছাড়া আছে কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য । যেখানে কাব্যের আধারে নাটক রচিত হয় সেটি কাব্যনাট্য, আর যে রচনায় নাটকের স্থান প্রধান আর কাব্য কম শক্তিশালী- তা নাট্যকাব্য। রবীন্দ্রনাথ রচিত ‘কর্ণকুন্তীসংবাদ’, ‘বিদায়-অভিশাপ’, ‘গান্ধারীর আবেদন’, কাব্যনাট্য। ‘বিসর্জন’, ‘মালিনী’ — নাট্যকাব্য ।

নাটকের সঙ্গে আর একটি অভিনয় কলার উল্লেখ করা যেতে পারে তা হচ্ছে যাত্রা । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে যাত্রা সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। পূজা - পার্বণে, দেব - মন্দিরে, চন্ডীমন্ডপে যাত্রা পালা অনুষ্ঠিত হতো । এইসব পালার বিষয়বস্তু ছিল কালীয়া দমন, কৃষ্ণযাত্রা, শিবযাত্রা, চৈতন্যমঙ্গল ইত্যাদি ।

(v) পত্রসাহিত্য ঃ

বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ঠ শাখা পত্রসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদের যে পত্রাদি লিখেছিলেন তা নিয়েই মূলতঃ বাংলা ভাষার পত্রসাহিত্য । চিঠি পত্র লেখা একসময়ে আমাদের রোজকার জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে ধীরে ধীরে চিঠি লেখার প্রয়োজন আর রইলো না। কাজের প্রয়োজনে লেখা চিঠি যখন তার গন্ডি অতিক্রম করে মনের ভাব, অনুভূতি, উচ্ছ্বাসকে বহন করে তখন তা সাহিত্য রস সমৃদ্ধ হয়ে উঠে সাহিত্যের মর্যাদা পায়। পত্রসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — “যারা ভালো চিঠি লেখে তারা মনের জানালার ধারে বসে আলাপ করে যায়।” রবীন্দ্রনাথের ‘ছিন্নপত্র’, “পথে ও পথের প্রান্তে” প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পত্রসাহিত্যের নিদর্শন। স্বামী বিবেকানন্দের লিখিত চিঠিগুলিও একধারে সাহিত্যরস সমৃদ্ধ ও অন্যদিকে অভিজ্ঞ মানুষের পর্যবেক্ষণ দক্ষতার স্মরণীয় নিদর্শন।

রেখাচিত্র ঃ

রেখা ও চিত্রের সমন্বয়ে কোনো বিষয়কে নির্দিষ্ট করে তুলে ধরতে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় তাকে রেখাচিত্র (Diagram) বলে। রেখাচিত্রের সাহায্যে কোন বিষয়কে সহজে বোঝানো যেতে পারে । এ পর্যন্ত সাহিত্যের বিভিন্ন ধরনের যে সব ধারা আলোচনা করা হল তাকে রেখাচিত্রর সাহায্যে দেখানো যায়।

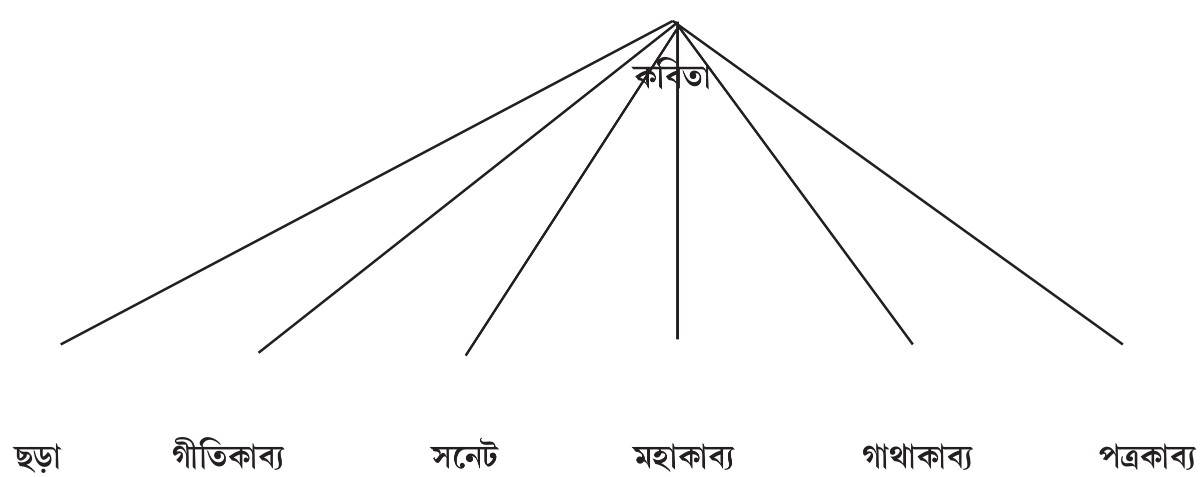

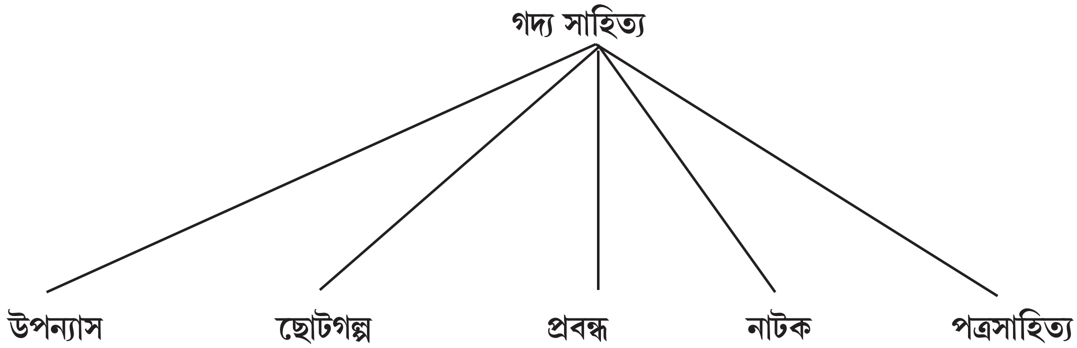

এইভাবে পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়কে রেখার সাহায্যে যদি বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে শিক্ষার্থীরা তা সহজে বুঝতে পারবে। শিক্ষার সহায়ক সামগ্রীরূপে রেখাচিত্রের বিশেষ মূল্য আছে।

প্রতিবেদন (Reporting)

প্রতিবেদন বলতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধানভিত্তিক বিবরণী বোঝায়। এই শব্দটির ইংরেজি অনুবাদ রিপোর্টিং (Reporting)। কোনো ঘটনা, তথ্য বা বক্তব্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য প্রদানই প্রতিবেদন। অর্থাৎ প্রতিবেদন রচনায় সময়, ঘটনা বা বিষয়বস্তুর বিবরণীই প্রধান। এখানে প্রতিবেদকের (প্রতিবেদন যিনি লেখেন) ব্যক্তিগত আবেগ উচ্ছ্বাসের কোনো স্থান নেই। সাধারণভাবে প্রতিবেদন বলতে আমরা খবরের কাগজের আর্টিকেলকে বুঝে থাকি। এছাড়া গবেষণা প্রতিবেদন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়ভিত্তিক প্রতিবেদন, তদন্ত প্রতিবেদন প্রভৃতি আরো নানা ধরনের প্রতিবেদন হয়ে থাকে। প্রতিবেদনে শব্দের কারিগরি বা বর্ণময় ভাষার তেমন প্রাধান্য না থাকলেও প্রতিবেদন সাহিত্যমূলক হওয়া উচিত। প্রতিবেদনের আকার তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে । প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট কাঠামো, সঠিক তথ্য, সম্পূর্ণতা, স্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততার সুন্দর উপস্থাপনা থাকে। দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া যে কোনো বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন লেখা যেতে পারে, যেমন— সাক্ষরতা অভিযান বিষয়ক, পুরস্কার বিতরণী সভা, দুর্ঘটনা, মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি । আজকের সংবাদপত্র প্রতিবেদনের উপর বিশেষভাবে আধারিত। প্রতিবেদনে কোথাও নিজস্ব প্রতিনিধি, কোথাও স্টাফ রিপোর্টার অথবা কোথাও নিজস্ব নামও ব্যবহার করা হয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ঘটনাস্থলের নামকরণ করা হয়। প্রয়োজনে ঘটনার তারিখ দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন "নিজস্ব সংবাদদাতা, '৩রা জানুয়ারী, পাটনা"। একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হলো —

শিল্পমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, 10 ই ফেব্রুয়ারী 2023, শুক্রবার, পাটনা ঃ স্থানীয় গান্ধী ময়দানে পাঁচ দিনব্যাপী একটি শিল্পমেলার আয়োজন করেন বিহারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রালয় । মেলাটির উদঘাটন করেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। মেলাটির মুখ্য উদ্দেশ্য বিহারের গ্রামীণ শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া ও সর্বজনের সামনে তাদের কারিগরীকে তুলে ধরা। মেলাটির বিভিন্ন স্টলে বিহারের মধুবনী শিল্প, রেশম শিল্প, কাঠের নানা কাজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার জিনিস দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মঞ্চে বিহারের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিল্পীরা নিজেদের শৈল্পিক দক্ষতায় দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। 14ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মেলাটি চলবে।

উপরে আলোচিত সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। তাই পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করার সময়

সাহিত্যের বিভিন্ন সময়ের, ভিন্ন ভিন্ন ধারার, ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিকদের উচ্চমানের রচনাকে স্থান দিতে হয়।

সাহিত্য শিক্ষার নিয়মাবলী ঃ

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণিতে নানা ধরনের সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত ।

(a) পাঠ্যপুস্তকে সাহিত্যগুণ আছে এমন রচনা রাখতে হবে ।

(b) নীরব পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সরব পাঠের প্রতিও সজাগ হতে হবে।

(c) জটিলতা না বাড়িয়ে সহজ, সরল এবং রসোত্তীর্ণ করে সাহিত্য পড়াতে হবে । এমনভাবে পড়াতে হবে যেন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তা আকর্ষণীয় হয় ।

(d) নানা ধরনের শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার করতে হবে। অভিনয়, দূরদর্শন, কম্পিউটার, সি.ডি, বিভিন্ন শিক্ষামূলক চ্যানেলের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে ।

(e) শিক্ষাদর্শন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিশু মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল শিক্ষাদানের উপর জোর দিতে হবে ।

(f) শুধু পাঠ্যপুস্তকই নয় গ্রন্থাগারের উপযোগিতা বিষয়েও ছাত্র-ছাত্রীদের জানাতে হবে । গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রতি সজাগ থাকতে হবে।

(g) বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিতেই সাহিত্য অনুশীলনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

(h) পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রচনাত্মক (creative) কার্যাবলী যেমন — অভিনয়, আবৃত্তি, নিজে থেকে কিছু লেখা ইত্যাদির প্রতি উৎসাহ জাগাতে হবে ।

ব্যাকরণ শিক্ষা

ব্যাকরণ হল ভাষার ব্যবহারিক বিশ্লেষণ, ভাষার দৈহিক গঠন । ভাষা মনের ভাব প্রকাশ করে। সুতরাং ব্যাকরণের কাজ ভাষার শারীরিক গঠনকে বিশ্লেষণ করে তার গঠন বৈশিষ্ট্য বুঝতে আমাদের সাহায্য করা। তাই ব্যাকরণকে আমরা ভাষার বিজ্ঞানও বলতে পারি । ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে — "যে বিদ্যার দ্বারা কোন ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার পঠনে, লিখনে ও কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায় সেই বিদ্যাকে ভাষার ব্যাকরণ বলে।" ব্যাকরণের মধ্যে দিয়ে আমরা ভাষার উদ্ভব, বিকাশ, স্বরূপ, প্রকৃতি, বিশেষত্ব, প্রয়োগ-রীতি প্রভৃতিকে যথাযথভাবে জানতে পারি।

বাংলা ভাষাতেও বিজ্ঞান সম্মত ব্যাকরণ আছে। ভারতবর্ষে বিদেশীরা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ লেখে। কারণ একটাই, তারা বাংলা ভাষা শিখতে চেয়ে ছিল । এই কাজটি করেন 1743 খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ পাদ্রী মনোএল-দা আসুম্পসাও একটি বাংলা ব্যাকরণ অভিধান সংকলন করে। এটির নাম ছিল 'পর্তুগীজ-বাংলা ভাষায় অভিধান ও ব্যাকরণ'। 1778 খ্রিস্টাব্দে হ্যালহেড তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থটি সংকলন করেন। হ্যালহেডের ব্যাকরণের ভাষা ছিল ইংরেজী কিন্তু দৃষ্টান্তগুলি ছিল বাংলা । 1833 খ্রিস্টাব্দে রামমোহন রায় রচিত বাংলা ব্যাকরণ 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'ই বাঙালির লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ । এই সময়কার সব ব্যাকরণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অবাঙালি ও বিদেশীদের বাংলা শেখানো । পরবর্তীকালে বিভিন্ন ব্যাকরণবিদ ও ভাষা বিজ্ঞানী তাঁদের মূল্যবান ও মৌলিক চিন্তাধারায় বাংলা ব্যাকরণকে সমৃদ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, কৃষ্ণপদ গোস্বামী, শ্যামাপদ চক্রবর্তী প্রভৃতিরা বাংলা ব্যাকরণকে বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিয়েছেন ।

ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

মানুষ প্রথমে ভাষা শেখে, পরে ব্যাকরণ। মানুষের মনের ভাব বা মানসিক প্রবৃত্তিগুলি সকলের সামনে প্রকাশের জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন হয় না। প্রাচীনপন্থী কিছু শিক্ষাবিদরা তাঁদের বিচার ব্যক্ত করে বলেছেন ব্যাকরণ শিক্ষা এবং ভাষা শিক্ষা অভিন্ন । আধুনিক বিচারে

আমরা বলতে পারি যে কয়েকটি কারণে ব্যাকরণ শিক্ষা অপরিহার্য । ব্যাকরণ শিক্ষা ভাষা ব্যবহারে শুদ্ধতা আনে, লিখতে, বলতে শেখায় এবং সেই সঙ্গে ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে বাংলা ভাষায় মৌখিক এবং লিখিত রূপ আছে এবং এতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। শিক্ষার্থী যদি ব্যাকরণ সঠিকভাবে না জানে তাহলে সাধুভাষা এবং কথ্যভাষায় মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী। আধুনিক যুগে বাংলার লিখিত রূপটিও কথ্যভাষার, তবু শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে অবশ্যই সজাগ হতে হবে। এখন লিখিত বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ অনেক কম, মোটামুটি তদ্ভব শব্দই বহুল প্রচলিত। তাই ব্যাকরণচর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শব্দের প্রয়োগ এবং বাক্য ব্যবহার ও গঠনে জ্ঞান বৃদ্ধি হতে পারে । ব্যাকরণের চর্চা থাকলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় । এর ফলে তাদের লিখন পদ্ধতিও অনেকটা শুদ্ধ হবে। ভাষায় লিখিত রূপ যদি সঠিক হয় তাহলে সাহিত্য নির্মিতিতেও তার প্রভাব পড়বে ।

বাংলা ভাষায় লব্ধ ব্যাকরণের জ্ঞান শিক্ষার্থীদের অন্যান্য ভাষা শিক্ষায় সহায়তা করে। আবার অন্যান্য ভাষার চর্চাও শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষার উপর দখল বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষার চর্চা করতে করতে ওই ভাষায় শব্দ ভান্ডার কিংবা ওই ভাষায় ব্যবহৃত বাক্য সমূহের গঠনভঙ্গির দ্বারা বাংলা ভাষার প্রকাশভঙ্গিও অনেক সময় প্রবাহিত হয় তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে নতুন ভাব প্রকাশ করতে সুবিধা হয়।

ব্যাকরণ শিক্ষার নিয়মাবলী ঃ

বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে গেলে অর্থাৎ তাকে সঠিক ও সার্থক করে তুলতে গেলে কিছু নিয়মের প্রয়োজন । সেগুলি নিম্নলিখিত হতে পারে —

(ক) ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য চাই বিশ্লেষণের ক্ষমতা, একটু বয়স না বাড়লে সেই ক্ষমতা হয় না। তাই পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ব্যাকরণের পাঠ তাদের পাঠ্যপুস্তকের পাঠের মধ্যে থেকে গ্রহণ করে, ব্যাকরণের সূত্রগুলিকে সহজ ভাষায় যুক্তি বুদ্ধিগ্রাহ্য ও সরলভাবে উপস্থাপিত করতে হবে। এর জন্য বিভিন্ন উদাহরণের প্রয়োজন হয় । সেগুলি শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে গ্রহণ করলে তাদের কাছে তা আরও সহজ হবে।

(খ) সহজভাবে ব্যাকরণকে না বোঝালে তা ছোট - ছোট শিশুর কাছে নীরস, কঠিন ও জটিল বলে মনে হয়। তাই শিক্ষক ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সময় সহানুভূতিশীল হবেন। তিনি শিক্ষাদানের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে অবশ্যই অভিজ্ঞ হবেন।

(গ) ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তক হতে হবে সহজ ও সরল । ভাষাও সাবলীল হওয়া চাই। প্রতিদিনের জীবন থেকে নেওয়া উদাহরণ শিশুমনকে আকৃষ্ট করবে ।

(ঘ) ব্যাকরণ তৈরি হয়েছে ভাষার জন্য। ব্যাকরণের জন্য ভাষা ও সাহিত্য নয়। খেয়াল রাখতে হবে ব্যাকরণের অযথা কচকচানি যেন ভাষা ও সাহিত্যের সৌন্দর্য নষ্ট না করে।

(ঙ) ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সময় বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ (Teaching Learning Meterial) ব্যবহার করতে হবে। ব্ল্যাকবোর্ড, চার্ট প্রভৃতি ব্যাকরণ শিক্ষাদানের উপযুক্ত সহায়ক সামগ্রী ।

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের পদ্ধতি ঃ

ব্যাকরণ শিক্ষার কয়েকটি পদ্ধতির কথাও বলা যেতে পারে যার অনুসরণে এই শিক্ষাদান আরও অনেক সহজ হবে।

(a) সূত্র পদ্ধতি (Formula Method) ঃ

ব্যাকরণ শিক্ষা কিছু সূত্রের উপর নির্ভরশীল । এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের সূত্র বার-বার পড়ে, বুঝে উদাহরণের সাহায্যে প্রয়োগ করে। এটি প্রাচীন পদ্ধতি এবং ব্যাকরণের বইগুলি এই পদ্ধতিতেই রচিত । কিন্তু এই পদ্ধতিতে অনেক দোষ আছে। যদিও শিক্ষক অপেক্ষাকৃত

কম সময়ে এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অনেক নিয়ম শেখাতে পারেন। সূত্র পদ্ধতির মূল ত্রুটি এই যে এটি একটি নীরস পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীরা কিছু না বুঝেই ব্যাকরণ মুখস্থ করে। তাই ব্যাকরণের ব্যবহার সম্বন্ধে তাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় না ।

(b) ভাষা পদ্ধতি (Language Method) ঃ

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এটিই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ্ধতি । সাহিত্যের পাঠ পড়াতে পড়াতে ভাষার মধ্যে ব্যাকরণের নানা প্রয়োগ দেখিয়ে ধীরে ধীরে ব্যাকরণ সম্পর্কে অবহিত করা হয় এই পদ্ধতিতে । শ্রেণিকক্ষে নানা প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, অনুশীলনী, রচনা ইত্যাদি থেকে স্বাভাবিক ভাবে ব্যাকরণের শিক্ষা দান করা হয়ে থাকে। ছোট শিশুরা ব্যাকরণের জ্ঞান ছাড়াই অনেক ক্ষেত্রে ব্যাকরণের শুদ্ধ প্রয়োগ করতে শিখে যায়। শিক্ষার্থীরা যেন তাদের কথা বলার ও লেখার মধ্যে বিশুদ্ধতা বজায় রাখে, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়।

(c) পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি (Text Book Method) ঃ

বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের একটি নিজস্ব ভূমিকা আছে । এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শ্রেণির জন্য যে পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত থাকে সেগুলির সাহায্যে শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণের বিভিন্ন নিয়ম শেখান। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকদের সুবিধা হলেও শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর করতে হয়, তাই ব্যাকরণ শিক্ষার প্রতি তাদের তেমন আগ্রহ জন্মায় না । শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি, বিচার ক্ষমতা ও চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে না ।

(d) বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Analytic Method) ঃ

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণের সূত্রগুলিকে মুখস্থ করতে না বলে, সেইগুলি তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে এবং উদাহরণের সাহায্যে যুক্তি দিয়ে বিচার করে সূত্রগুলিকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। এই পদ্ধতি বুদ্ধিমান ছাত্রদের পক্ষে আকর্ষণীয় হলেও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের কাছে একটি ভীতির কারণ হতে পারে ।

(e) আরোহী পদ্ধতি (Inductive Method) ঃ

এই পদ্ধতিটি ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী বলে মনে করা হয়। এই পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের সার্থক অনুসারী। এই পদ্ধতির মূল কথা উদাহরণ থেকে সূত্র । শিক্ষার্থীদের সামনে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হয়। সেই উদাহরণগুলিকে বিচার - বিশ্লেষণ করে নিজের চিন্তা ও যুক্তি - বিন্যাস ক্ষমতার সাহায্যে স্বাভাবিক পথে সিদ্ধান্তে পৌঁছবে । যেমন —

হিম + আলয় = হিমালয় (অ + আ = আ)

কথা + অমৃত = কথামৃত (আ + অ = আ)

এখানে সূত্র হল ‘অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয় মিলে আ-কার হয় । আ - কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয় ।’ (সন্ধি)

বিভিন্ন উদাহরণ সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সূত্র থাকবার ফলে শিক্ষা গ্রহণে তারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে । শুদ্ধভাবে ভাষা ব্যবহার, ভাষা বিশ্লেষণ, ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি যদি ব্যাকরণের উদ্দেশ্য হয়, তবে তা আরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বাধিক অর্জন করা যায়।

(f) অবরোহী পদ্ধতি (Deductive Method) ঃ

এই পদ্ধতি আরোহী পদ্ধতির একেবারে বিপরীত । অর্থাৎ এই পদ্ধতির মূল কথা হল ‘সূত্র থেকে উদাহরণ’। এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণের কোন সূত্রকে শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করে। তারপর তারা তাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রয়োগ করে তার নির্ভুলতা প্রমাণ করে। যেমন —

সূত্র — ‘অ’ - কার কিংবা ‘আ’- কারের পর ‘অ’ কার কিংবা ‘আ’-কার থাকলে উভয়ে মিলে ‘আ’-কার হয় ও এই আ-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত

হয়।’ (সন্ধি)

সোনা + আলি = সোনালী (আ + অ = আ)

নব + অন্ন = নবান্ন (অ + অ = আ)

এই পদ্ধতিতে সূত্রকে বারবার মুখস্থ করতে হয় বলে তা শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে না।

সারাংশ ঃ

বাংলা ভাষা - সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ । বাংলা ভাষা মগ্ধী - অপভ্রংশের প্রভাব মুক্ত হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করে দশম শতাব্দী বা তারও কিছু আগে। এই সময়ের প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন হলো চর্যাপদ বা চর্যাচর্যবিনিশ্চয় । এরপর থেকে এখনো পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য বিভিন্ন ধারায় অসংখ্য সাহিত্যিকদের অসংখ্য লেখার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। পদ্য সাহিত্য ও গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করতে পাঠ্যপুস্তকে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার, বিভিন্ন কালের, বিভিন্ন সাহিত্যকদের শ্রেষ্ঠ রচনাকে গ্রহণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের সাহিত্যের প্রতি রুচি, আগ্রহ জাগাতে, তাদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করতে, পঠন শক্তির উন্মেষ ঘটাতে, শব্দজ্ঞান, শব্দচেতনা, বাক্যের মধ্যে বিন্যস্ত পদগুলির পরিচয় সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সঠিক পাঠ নির্বাচন অত্যন্ত আবশ্যক।

সাহিত্যের সঙ্গে ভাষার শুদ্ধ জ্ঞান হওয়াও আবশ্যক। ভাষার বিজ্ঞান বা শাস্ত্র হলো ব্যাকরণ। মাতৃভাষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ শিক্ষাদান অপরিহার্য কারণ ব্যাকরণের জ্ঞানই ভাষাকে শুদ্ধভাবে গ্রহণ করতে ও প্রয়োগ করতে সাহায্য করে, ভাষাকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে স্থায়ী রূপ দেয়। ভাষার শুদ্ধ রূপ রক্ষার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন। ব্যাকরণের সূত্রগুলি সহজ ভাষায় যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য করে উপস্থাপিত করতে হবে। উদাহরণগুলি শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষককে ব্যাকরণের শিক্ষাদানের সময় সহানুভূতিশীল হতে হবে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি জেনে সেইগুলি যথাযথ জায়গায় ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের প্রতি আগ্রহী ও সক্রিয় অংশদানকারী হয়ে ওঠে । মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর না করে বিষয়বস্তু বুঝে তার সঠিক ব্যবহার করতে শেখে। মনে রাখতে হবে ব্যাকরণ ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাকে সহজ করে, ভাষার ব্যবহারকে শুদ্ধ করে।

অনুশীলনী

1. সাহিত্য শিক্ষা ও ব্যাকরণ শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কী ?
2. বাংলা সাহিত্য ধারার সাধারণ পরিচয় দাও ।
3. বাংলা কবিতার সম্বন্ধে যা জানো লেখো ।
4. পদ্য সাহিত্যের চারটি ধারার সম্বন্ধে লেখো ।
5. সাহিত্য ধারার শিক্ষাতে কী ধরনের নিয়মাবলীর প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত ?
6. ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখো ।
7. ব্যাকরণ শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কী কী ? যে কোনো চারটি পদ্ধতি সম্পর্কে লেখো ।
8. ব্যাকরণ শিক্ষাদানের নিয়মাবলীগুলি সম্বন্ধে লেখো ।
9. ব্যাকরণ কাকে বলে ? বাংলা ব্যাকরণের প্রারম্ভিক ইতিহাস সম্বন্ধে লেখো ।
10. টীকা লেখো —

A. উপন্যাস

B. গীতিকবিতা

C. প্রবন্ধ

D. সূত্র পদ্ধতি

E. আরোহী পদ্ধতি

F. রেখাচিত্র

একক - 5

বাংলা ভাষার দক্ষতা নিরূপণ

* ভূমিকা (Introduction)
* উদ্দেশ্য (Objectives)
* শিক্ষণ - শিখন উপকরণ (Teaching - Learning Meterial)
* মূল্যায়ন (Evaluation)
* শিখন পরিকল্পনা (Learning Plan)
* কর্মপত্র বা কাজের পাতা (Work Sheet)
* বাংলা ভাষার প্রশ্ন পত্র নির্মাণ
* কার্যকলাপ
* প্রস্তাবিত কার্য
* প্রস্তাবিত পাঠ
* সারাংশ
* অনুশীলনী

"মাতৃসম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা
তুমি তার সেবা কর সুখে।"

– ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ভূমিকা ঃ

মানব জগতে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করার মাধ্যম হলো ভাষা । ভাষার সাহায্যে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। নিজেদের রকমারি সমস্যার সমাধান এই ভাষার মাধ্যমেই হয়। একে অপরের সুখ - দুঃখের অংশীদার হতে এই ভাষাই সাহায্য করে । তাই বলা যেতে পারে, আমাদের চিত্তের মুক্তির জন্য ভাষা একান্ত প্রয়োজনীয় ।

বাংলা ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাঠ্য বিষয়কে আনন্দময় ও মনোগ্রাহী করতে শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বহির্ভূত অন্যান্য কিছু শিশু ও কিশোর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় । যেমন — ছোট - ছোট ছড়া, মজার গল্প, রূপকথা, বীরত্বব্যঞ্জক গল্প, রোমহর্ষক গল্প, কমিক্স প্রভৃতি। তারপর সেই পাঠগুলি থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে তাদের বোঝাবার ক্ষমতার মাধ্যমে কুশলতার বৃদ্ধি করা হয় ।

উত্তরসূরীকে ভাষা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষা জ্ঞান কতটা হয়েছে, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য মূল্যায়ন আবশ্যক । আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো, জীবনের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন । মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষার লক্ষ্য কতটা পূর্ণ হয়েছে, তা বিচার করা হয়। যা গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থায় সম্ভব নয় । তাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা শব্দের বদলে 'মূল্যায়ন' শব্দের ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষার্থীকে পড়ানোর আগে শিখন পরিকল্পনা (Learning Plan) তৈরি করতে হয় এবং এই বিধি অনুসারে শিক্ষণ কার্য শুরু করা হয়। এই বিধির মধ্যে অনুশীলনী ও প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা থাকে । ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শিক্ষণ-শিখন উপকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয় ।

উদ্দেশ্য ঃ

* শিক্ষার কর্মসূচি বা লক্ষ্য স্থির করা ।
* শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের কুশলতার মূল্যায়ন করা ।
* শিক্ষার্থীদের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তন ।
* শিক্ষাদানের যথার্থ ফল প্রাপ্তিতে সহায়ক ।
* প্রশ্নপত্র নির্মাণের নানা প্রকার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় ।
* শিক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং তার ফল প্রকাশের ব্যবস্থা তাদের পাঠের উৎসাহ বৃদ্ধি করে ।
* শিক্ষণ - শিখন উপকরণের ব্যবহার কীভাবে পাঠকে সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় করে সে সম্পর্কে অবগত করানো ।
* যথাযথ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষাদানের মাধ্যমে বাংলা ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন ।

শিক্ষণ - শিখন উপকরণ (Teaching - Learning Meterial) ঃ

যে সব উপকরণ ব্যবহার করলে শিশুদের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপিত করে তোলা সম্ভব হয় ও তাদের শিক্ষণীয় বিষয়কে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করে তোলা যায় তাকে শিক্ষণ - শিখন উপকরণ বা শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বলে। আধুনিক শিক্ষাদর্শন ও মনোবিজ্ঞানে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ অপরিহার্য অঙ্গ । শিক্ষণ - শিখন উপকরণগুলি শিক্ষার্থীর মনে প্রত্যক্ষ আবেদন (direct appeal) সৃষ্টি করে, ধারণাকে পূর্ণ করে অভিজ্ঞতাকে বাস্তবায়িত করে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণকে কার্যকর করতে গেলে ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষককেও কিছু কিছু শিক্ষণ - শিখন উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। কারণ শুধু মাত্র মৌখিক শিক্ষণ (oral teaching) দ্বারা শ্রেণি শিক্ষণ পূর্ণতা পায় না । মৌখিক শিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম সহায়ক সামগ্রীর (Teaching aids) ব্যবহারও প্রয়োজনীয় । এতে বিমূর্ত ধারণা মূর্তভাবে উপস্থাপিত হয়, নীরস জটিল বিষয়বস্তু জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়, চিন্তাশক্তি জাগ্রত হয়, মনকে যুক্তিনির্ভর করে এবং অর্জিত জ্ঞান স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

প্রয়োজনীয়তা ঃ

* জটিল ও নীরস বিষয়বস্তুকে সহজতর করে তোলে।
* বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে তোলে ।
* শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুক্তিবোধ ও মননশীলতার বিকাশ ঘটে ।
* শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী ও মনোযোগী করে তোলে ।

শ্রেণি বিভাগ ঃ

(1) দৃশ্য নির্ভর ঃ এই ধরণের শিক্ষণ - শিখন উপকরণ মূলত চিরাচরিত । যা শিক্ষার্থীরা চোখে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। এই জাতীয় উপকরণগুলি সংগ্রহ করাও অপেক্ষাকৃত সহজ ।

(2) শ্রুতিনির্ভর ঃ এই ধরনের শিক্ষণ- শিখন উপকরণ মূলত আধুনিক। এগুলির আবেদন কেবলমাত্র কানের কাছে অর্থাৎ কেবল মাত্র শ্রবণ - শক্তির দ্বারা এই উপকরণগুলির ব্যবহারের সার্থকতা ।

(3) দৃশ্য ও শ্রুতিনির্ভর ঃ অন্যান্য শিক্ষণ- শিখন উপকরণগুলি থেকে এই উপকরণগুলি সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসু এবং কার্যকরী। এতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়ের উপর তৈরি শিক্ষণ - শিখন উপকরণটি চোখে দেখে এবং কানে শুনে পাঠ্য বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে । এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গুলি সচেতন থাকে বলে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের স্মৃতিতে দীর্ঘস্থায়ী ও বোধগম্য হয়।

শিক্ষণ - শিখন উপকরণের বিভিন্ন প্রকার

(Types of Teaching - Learning Material)

দৃশ্য নির্ভর

(Visual)

1. লেখার ফলক (Writing Board)
2. বুলেটিন বোর্ড (Bulletin Board)
3. সংবাদপত্র (News paper)
4. রেখাচিত্র (Graph)
5. মানচিত্র (Map)
6. লেখাচিত্র (Chart)
7. ছবি (Picture)
8. অনুকৃতি (Model)
9. গ্লোব (Globe)

শ্রুতি নির্ভর

(Audio)

1. রেডিয়ো (Radio)
2. টেপরেকর্ডার (Tape Recorder)

শ্রুতি দৃশ্য নির্ভর

(Audio -Visual)

1. দূরদর্শন (Television)
2. কম্পিউটার (Computer)
3. মাল্টিমিডিয়া (Multimedia)
4. স্মার্ট ফোন (Smart Phone)
5. ফিল্ম, ল্যাপটপ, ভিডিও (Film, Laptop, Video)
6. প্রজেক্টর (Projector)

মূল্যায়ন (Evaluation)

শিক্ষা হল, শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ।আর এই বিকাশকে নির্ণয় করার জন্য যে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাকে মূল্যায়ন বলে ।মূল্যায়নের অনেক নিয়ম-নীতি আছে। বিভিন্ন পদ্ধতিও আছে ।শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল্যায়নের জন্য নানান অভিনব পন্থাও অবলম্বন করে থাকেন ।

নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিশুর বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন 2009 - এর পঞ্চম অধ্যায়ের 29 নম্বর ধারায় 2 (জ) উপধারায় 6-14 বছর বয়সী সকল শিশুর অর্জিত জ্ঞানের বোধ এবং প্রয়োগের সামর্থ্য যাচাই করার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন এবং সার্বিক মূল্যায়নের (Continuous and Comprehensive Evaluation বা CCE) কথা বলা হয়েছে। এই মূল্যায়ন দ্বারা সারা বছর (শিক্ষাবর্ষ) ধরে শিক্ষার্থীর সার্বিক ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও তার নথিভুক্তিকরণ হয়ে থাকে।

মূল্যায়ন শব্দটির সঙ্গে আর একটি শব্দ যুক্ত, যেটি হলো Assessment ।যাকে বাংলায় ‘মূল্যায়ন / নির্ধারণ’, হিন্দিতে ‘আকলন’ বলে । এতে নম্বর এবং গ্রেডিং ছাড়া মূল্যায়ন করা হয়। শিখন কার্য চলাকালীন Assessment হয়। বলা যেতে পারে Assessment প্রক্রিয়া (Process) আর (Evaluation) হলো ফলাফল (Product) ।

মূল্যায়নের কয়েকটি স্বরূপ লেখাচিত্রের মাধ্যমে দেওয়া হলো —

নিরবিচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন

Continuous and Comprehensive Evaluation

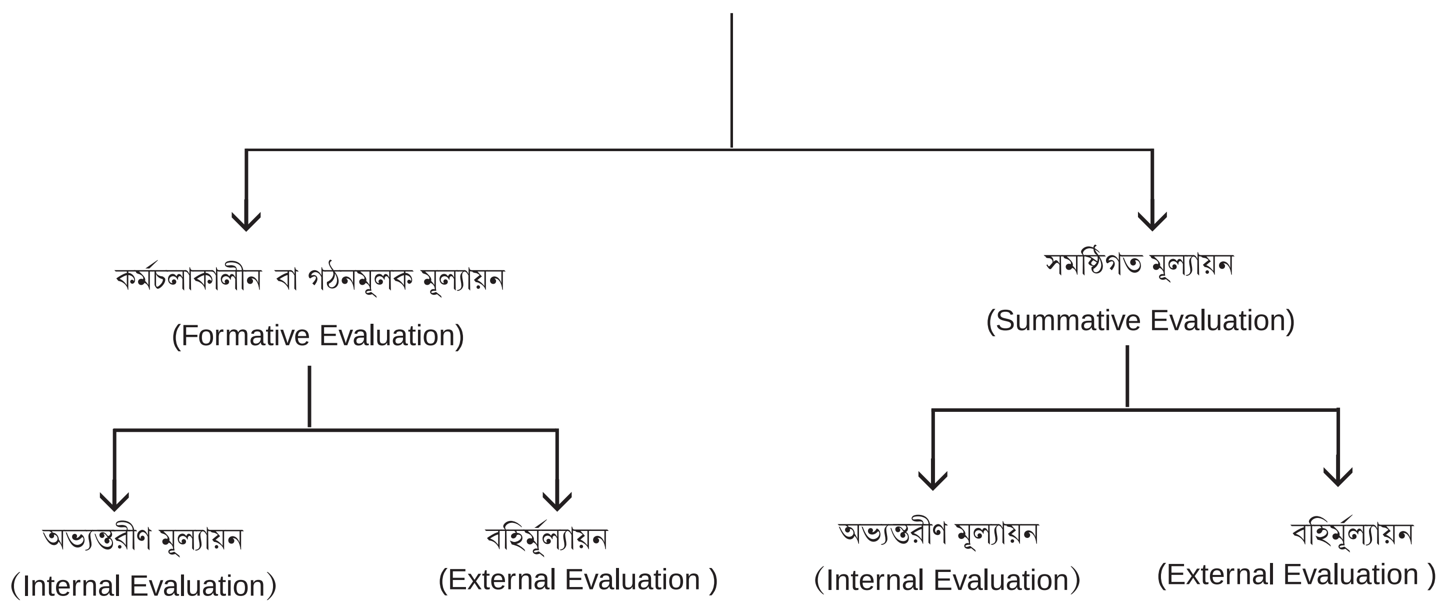

1. কর্মচলাকালীন বা গঠনমূলক মূল্যায়ন (Formative Evaluation) —

সাধারণত পাঠদানের সময় শিক্ষক - শিক্ষিকা যে মূল্যায়ন করে থাকেন তাকে কর্মচলাকালীন বা গঠনমূলক মূল্যায়ন বলা হয়ে থাকে । শ্রেণিকক্ষের ভেতরে ও বাইরে শিক্ষণের সময় এই মূল্যায়ন করা হয়।এই মূল্যায়নের জন্য পাঁচটি সূচকের কথা বলা হয়েছে ।এগুলি শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাপকাঠি রূপে ব্যবহৃত হবে ।

এই পাঁচটি সূচক বা নির্দেশক হল —

* অংশগ্রহণ (Participation)
* প্রশ্ন ও অনুসন্ধান (Questioning and Experimentation)
* ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য (Interpretation and Application)
* সমানুভূতি ও সহযোগিতা (Empathy and Co-operation)
* নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ (Aesthetic and Creative Expression)

2. সমষ্টিগত মূল্যায়ন (Summative Evaluation) —

নির্দিষ্ট সময়ে বা পর্বে বা স্তরে শিক্ষার্থীদের যে মূল্যায়ন হয়, তাকে সমষ্টিগত মূল্যায়ন বলে। এই মূল্যায়নে যে বিষয়গুলির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হয়, সেগুলি হল —

* প্রশ্নপত্রের মধ্যে উন্মুক্ত প্রশ্ন গঠন (Open - Ended Question Framing) এর দর্শন যেন কাজ করে ।
* প্রশ্ন এমন দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণী ক্ষমতা, সৃজনশীলতার লিখিত প্রকাশের সুযোগ থাকে ।
* শিক্ষার্থীর মধ্যে যেন অর্জিত জ্ঞানের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় তেমন প্রশ্ন দিতে হবে ।
* পর্যায়ক্রমে অর্জিত সামর্থ্যগুলির প্রয়োগের পর্যাপ্ত পরিসর থাকতে হবে ।

মূল্যায়ন লিখিতভাবে (Written), মৌখিকভাবে (Oral), প্রদত্ত কর্ম-সম্পাদনী (Assignment) দ্বারা, শিক্ষার্থীদের সৃজনমূলক কর্ম-সম্পাদন (Pupils Creative Activity) দ্বারা, পর্যবেক্ষণ (Observation), অনুসন্ধান তালিকা (Check - List), বিভিন্ন প্রকার বিবরণ (Different) দ্বারা করা যায়।

শিখন পরিকল্পনা (Learning Plan)

শিখন পরিকল্পনা বিহারের অধ্যাপক শিক্ষা কার্যক্রমের একটি নতুন সংযোজন । পারম্পরিক পাঠ -পরিকল্পনা (Lesson Plan) কে সমকালীন শিক্ষা দর্শনের অনুরূপে সংশোধন ও পরিমার্জন করে শিখন পরিকল্পনার রূপরেখা গড়ে তোলা হয়েছে ।

শিখন পরিকল্পনা হলো শেখার ক্ষেত্রে কীভাবে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করতে চাওয়া হয় এবং তার একটি বর্ণনা । শিখন পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে, সহজ বোধ্য রূপে পাঠদান করার কৌশল । এর মধ্যে দিয়ে একজন শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি দক্ষতা স্বল্প সময়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত শ্রেণির মধ্যে চর্চার সুযোগ পায়। এর ফলে শিক্ষণের প্রতি চিন্তন, মান এবং বিশ্লেষণ করার প্রবৃত্তির বিকাশ হয়। শিখন পরিকল্পনা পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এই পরিকল্পনার বাস্তবিক নির্মাণ শ্রেণিকক্ষের বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী হয়। এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দুজনের জন্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ ।

শিখন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ঃ

* শিখন পরিকল্পনা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তাকে দেখে তৈরি করা হয়।
* শিক্ষণের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে ।
* শ্রেণিকক্ষে নিয়ন্ত্রণ এনে শিখন পরিকল্পনা শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট কার্যকরী করে তোলে ।
* শিখন পরিকল্পনা দ্বারা পাঠক্রমের প্রতিটি একককে অত্যন্ত সহজভাবে বুঝতে সাহায্য করে ।

শেখার পরিকল্পনা তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হয় —

(i) সূচনামূলক বিবরণ থাকবে ।

(ii) বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধিত পূর্ব অভিজ্ঞতার সমীক্ষা—

(a) শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতা ।

(b) শিক্ষকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতা ।

(c) বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচির সঙ্গে বিষয়বস্তুর সম্বন্ধ ।

(iii) বিষয়বস্তুর বিবরণ এবং শেখার গুরুত্ব —

(a) এই বিষয়বস্তুতে কোন্ প্রকারের জ্ঞান নিহিত আছে ।

(b) শিক্ষার্থীদের এই বিষয়বস্তু কেন শিখতে হবে বা শেখা উচিত ।

(iv) শেখা ও শেখানোর জন্য শিক্ষণশাস্ত্রীয় পদ্ধতির চয়ন —

(a) শিক্ষণ পদ্ধতির চয়ন করা ।

(b) কেন এই পদ্ধতির চয়ন করা হলো, তার শিক্ষণশাস্ত্রীয় যুক্তি ।

(v) শিক্ষণশাস্ত্রীয় পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

(vi) শিক্ষক/ শিক্ষিকা দ্বারা স্বমূল্যায়নের পরামর্শ ।

(vii) অবলোকনকারী মন্তব্য—

(a) অবলোকনকারী দ্বারা শ্রেণি - শিক্ষণের চোখে দেখা বর্ণনা ।

(b) চোখে দেখা বর্ণনার সমীক্ষামূলক মন্তব্য এবং পরামর্শ ।

শিখন পরিকল্পনা (Learning Plan)
নমুনা পত্র

শিক্ষক / শিক্ষিকার নাম ঃ	পিরিয়ড ঃ
শ্রেণি ঃ	তারিখ ঃ
বিষয় ঃ	শিখণের আগে করতে হবে এমন কাজ ঃ
বিষয়বস্তু ঃ	শিক্ষণের আগে করতে হবে এমন কাজ ঃ
বিষয়বস্তুর পূর্ব সমীক্ষা ঃ	পূর্ব শিখনের এর বিষয়বস্তুর পুণরালোচনা
নতুন বিষয়বস্তুর চর্চা শুরু করতে হবে ঃ	

শিক্ষার্থীদের পূর্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যাচাই করা এবং পাঠ শিখনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বিষয় সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক কিছু প্রশ্নোত্তর পাঠ পড়ানো হবে ।

এই বিষয়বস্তুর এই শ্রেণির পাঠ্যক্রমে উল্লিখিত কোন উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্বন্ধিত, এই বিষয়বস্তু এই শ্রেণির পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচির নিম্ন উদ্দেশ্য পূরণ করে —

এই বিষয়বস্তুর কী আগের শ্রেণির পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল? কেমন করে —

আমি কী এই বিষয়বস্তুর শিক্ষণ আগে করেছি ? হ্যাঁ না

এই বিষয়বস্তু এই শ্রেণির আর কোন কোন বিষয় / এককের সঙ্গে যুক্ত ?

শ্রেণির শিক্ষার্থীর কাছে এই বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধিত কিছু আধারভুক্ত বক্তব্য থাকতে পারে কী ?
বিষয়বস্তু / উপ বিষয়বস্তুর বিবরণ (সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য)
শেখা ও শেখানোর পদ্ধতি (গদ্য, পদ্য- ব্যাকরণ রচনা ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক পৃথক পৃথক উপস্থাপন পদ্ধতি এবং শিখন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। কারণ প্রতিটি পৃথক বৈশিষ্ট্যর বিষয় বলে তার শিখন পদ্ধতিও আলাদা হবে)
পদ্ধতিগুলি কেন নির্বাচন করা হয়েছে ?
শেখার পদ্ধতি / পদ্ধতিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (শিখনের প্রথমে করতে হবে এমন কাজ)

বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পর সেই পাঠ থেকে শিক্ষার্থীর কতটা শিখন হলো এবং শিক্ষার্থী কতটা মনে রাখতে পারলো তা যাচাই করার জন্য তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করা হবে (জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক প্রশ্ন করা হবে)।
শিক্ষক / শিক্ষিকা দ্বারা স্বমূল্যায়নের বিভিন্ন পরামর্শ (শিক্ষণের পরের কার্য) শিক্ষার্থী কী সেই উদ্দেশ্যকে বুঝতে পেরেছে, যা বিষয়বস্তুতে ছিল ? বা এর মূল্যায়ন করেছেন কিনা ?
শ্রেণিকক্ষে পড়াবার সময় শিক্ষক অনুভব করবেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই পাঠটি পাঠ্যপুস্তকে রাখা হয়েছে, তা সফল হয়েছে কিনা। এই বিষয়বস্তুকে কী আবার শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে ? কেন এবং কেন নয় ?
শিক্ষার্থীদের কোন কোন মুখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ? কতজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ?
শিক্ষক এই প্রশ্নগুলির উত্তর কেমন করে বোঝালেন ? শিক্ষার্থীরা কী স্বয়ং এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার সুযোগ পেয়েছিল ?

এই বিষয়বস্তুকে বোঝাবার জন্য কোন কোন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহৃত হলো ? তার উপযোগিতা কি ছিল ?
এই বিষয়বস্তুকে যদি আবারও পড়াতে হয় তাহলে শেখা ও শেখানোর পদ্ধতিতে কি পরিবর্তন আনা হবে ?
এই বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধিত কোন এমন প্রশ্ন - যার সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠানের কারো সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন আছে — কোন অন্য টিপ্পনী সংশোধনী পাঠ (উপস্থাপনের পর মূল্যায়ন করে যদি দেখা যায় অন্তত একজন শিক্ষার্থীও উক্ত বিষয় শিখনে অপারগ বা ব্যর্থ হয়েছে কিংবা শিখনের বিষয়বস্তুর কোন অংশ ঠিকঠাক শিখতে পারেনি, তাহলে উক্ত বিষয়বস্তুকে পুণরায় শিখনের জন্য সংশোধনী পাঠ দিতে হবে।)

কর্মপত্র বা কাজের পাতা (Work Sheet)

যে কোন বিষয়ের বিষয়বস্তু - নির্ভর নির্দেশিকা, যা শিক্ষার্থী তার পূর্বের অভিজ্ঞতা ও বর্তমান অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পূরণ করে থাকে, তাকে কর্মপত্র বা কাজের পাতা (Work Sheet) বলা হয়ে থাকে । কর্মপত্র প্রাক্ প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসূচির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। পাঠ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের নানারকম পারদর্শিতা বুঝতে পাঠ শুরু করার আগে, পরে ও পাঠ চলাকালীন সময়ে কর্মপত্র দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ আয়োজন, উপস্থাপন ও মূল্যায়নে কর্মপত্র দেওয়া হয়ে থাকে।

পাঠের আগে কর্মপত্র দেওয়ার সময় শিক্ষক / শিক্ষিকাকে খেয়াল রাখতে হবে যে, কর্মপত্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে নতুন পাঠে প্রবেশের যেন একটা সম্পর্ক থাকে ।

উপস্থাপন ক্ষেত্রে কর্মপত্র, দলগত কাজে দেওয়া হয়ে থাকে । যা কিনা বিষয়বস্তুর সঙ্গে অবশ্যই সংগতিপূর্ণ হবে ।

মূল্যায়ন স্তরের কর্মপত্র এমন হবে যার থেকে শিক্ষার্থীর বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়েছে কিনা এবং শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে কতটা সংযোগ সাধন করতে পেরেছে তা দেখা হয় ।

কর্মপত্র দেওয়ার পর শিক্ষক / শিক্ষিকা যা করবেন তা হল —

1. শিক্ষার্থীরা কর্মপত্র নিয়ে কীভাবে আলোচনায় অংশ নিচ্ছে, তা লক্ষ্য করবেন ।
2. কে কী লিখছে তা দেখবেন ?
3. যে যা লিখছে বা করছে তার উপর ভিত্তি করে তথ্য সংরক্ষণ করবেন ।
4. কারো লেখা ভুল হয়েছে সর্বসমক্ষে বলবেন না ।
5. কর্মপত্র পূরণের সময় শ্রেণিতে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন ।
6. কর্মপত্র পূরণের আগে নির্দেশিকা দেবেন এবং শেষে নির্দেশিকা নিয়ে পুণরায় আলোচনা করবেন ।
7. আজকের কাজের জন্য সবার প্রশংসা করবেন ।
8. পরের দিন আরো ভালো করার জন্য সবাইকে উৎসাহিত করবেন ।

কর্মপত্র কিভাবে তৈরি করতে হবে অর্থাৎ তাতে কোন ধরণের প্রশ্ন থাকবে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হল —

1. ছবিটি দেখা ও ছবিতে যা যা আছে তা নিয়ে নিজেদের দলে বলাবলি করে আলোচনা করো ।
2. ছবির রং দেখো এবং পাশের ছবিগুলি রং করো ।
3. কোন ছবিটি বেশি আছে দেখে ঠিক চিহ্ন (✓) দাও ।
4. হাতের আঙুল গুণে ছবির সংখ্যা পাশের খোপে বসাও ।
5. খালি জায়গায় সঠিক সংখ্যা / শব্দ বসাও ।
6. বাম স্তম্ভের সঙ্গে ডান স্তম্ভের মিল দেখাও ।
7. গাছ থেকে আমরা কী কী পাই — তার তালিকা করো ।
8. জল কোথায় কোথায় পাওয়া যায়। চারটি নাম লেখো ।
9. ‘গরু’ -র সম্বন্ধে রচনা লেখো ।

কর্মপত্র (Work Sheet) - এর একটি নমুনা

শ্রেণি - তৃতীয় পূর্ণমান – 15

তারিখ — 9.12. 2022 প্রাপ্তমান –

1. অর্থ লেখো ঃ —

নিবিড় ——— খরা ——— 1x4 = 4

ক্ষয় ——— কর্তব্য ———

2. শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসাও ঃ — 1x2 = 2

A. গরমে জল ——— হয়ে যায় । (বরফ / বাষ্প / কাদা)

B. গাছপালা ও নদীর জলের একের সঙ্গে অন্যের ——— সম্পর্ক । (নিবিড় / দূরের / মারামারি)

3. স্তম্ভ A - র সঙ্গে স্তম্ভ B - র মিল দেখাও ঃ — 1x3 = 3

স্তম্ভ A	স্তম্ভ B
a. গাছপালা থাকলে	(i) বন্যা হয় ।
b. খরায় নদী-নালা	(ii) মাটির ক্ষয় কম হবে ।
c. অতি বৃষ্টিতে	(iii) সব শুকিয়ে যায় ।

4. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ — 1x4 = 4

বন্যা ——— কম ———

শুকনো ——— গরম ———

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও — 1x2 = 2

A. বৃষ্টির জল কিভাবে সাগরে গিয়ে মেশে ?

B. জলের ধারা কোথায় বাধা পায় ?

বাংলা ভাষার প্রশ্নপত্র নির্মাণ

পাঠ্যপুস্তককে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন শ্রেণিতে সারা বছর ধরে বিভিন্ন ভাবে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। সেইসব মূল্যায়নে (Work Sheet, Assignment, Formative, Summative etc.) বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন দেওয়া যেতে পারে । তারই কিছু নিদর্শন নিচে দেওয়া হলো—

1. **বৈকল্পিক প্রশ্ন** —

A. 'রামের কার্ত্তিক গণেশ' পাঠটি কার লেখা ?

a. রবীন্দ্রনাথ (b) শরৎচন্দ্র

c. তারাশংকর (d) নজরুল

B. 'ভিতর' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি ?

a. বাহির (b) অন্দর

c. বারান্দা (d) মধ্যে

2. **শূন্যস্থানে সঠিক শব্দটি বেছে লেখ** —

'কুকুরের কাজ ——— করেছে

কামড় দিয়েছে ———

তা বলে কুকুরে ——— কি রে,

——— শোভা পায় ?

(কামড়ানো, কুকুর, মানুষের, পায়)

3. **নিচের বাক্যগুলির মধ্যে ঠিক উত্তরের পাশে (✓) আর ভুল উত্তরের পাশে (X) চিহ্ন দাও** —

(A) নারায়ণী রামের কাকিমা হয় ।

(B) 'সুভাষ - স্মৃতি' পাঠটি বাসন্তী দেবী লিখেছেন ।

(C) বাংলা ভাষার জন্য আমরা গর্ববোধ করি ।

(D) রাখাল ছেলে সকাল বেলা কথা বলবে বলেছে ।

4. স্তম্ভ A - র সঙ্গে স্তম্ভ B - র মিল দেখাও —

স্তম্ভ A	স্তম্ভ B
a. বঙ্গভাষা	(i) কুমুদরঞ্জন মল্লিক
b. রাখাল ছেলে	(ii) বনফুল
c. দাদুর উত্তর	(iii) অতুলপ্রসাদ সেন
d. রামসুক তেওয়ারী	(iii) জসীমুদ্দীন

5. এক কথায় উত্তর দাও —

(A) কার্তিক গণেশ কাদের নাম ?

(B) ভাগলপুরে এসে শরৎচন্দ্র কার বাড়িতে উঠেছিলেন ?

(C) 'আমি জন্মই দিয়েছি, কিন্তু ওর মা তো আপনি' — কে বলেছিলেন ?

(D) রামসুকের অসুখের সংবাদ পেয়ে কে তার কাছে এসেছিল ?

6. সংক্ষেপে লেখো —

(A) চোর কেন রাজাকে অনুরোধ করেছিল, তাকে কঠিন শাস্তি না দেওয়ার জন্য ?

(B) রামধনুর সাতটি রং ছাড়াও খোকন আরো যে সব রং আকাশের গায়ে দেখেছিল, তা লেখো ।

7. বিস্তারিতভাবে লেখো —

(A) গল্পটির নাম 'রামের কার্তিক গণেশ' রাখা হয়েছে কেন ? গল্পটি অবলম্বনে বুঝিয়ে লেখো ।

(B) 'সবার আমি ছাত্র' কবিতাটিতে কবি নিজেকে 'সবার ছাত্র' বলেছেন কেন ?

8. অর্থ লেখো —

নিত্য, অন্ত, অভয়, সমন্বয় ।

9. বাক্য রচনা করো —

সাদা, পাখি, রাজা, বিকাল ।

10. রচনা লেখো —

'তোমার পাড়ার দুর্গাপুজো'

11. গরমের ছুটিতে তুমি সারা দুপুর কী করে কাটাতে চাও ? পাঁচটি বাক্যে লেখো ।

কার্যকলাপ

1. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের মূল্যায়ন করার জন্য শ্রেণিকক্ষে মৌখিক এবং লিখিত তাৎক্ষণিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন ।
2. এক বছরের পাঠ্য তালিকাকে (Syllabus) চার ভাগে ভাগ করে (Semester) পরীক্ষা নিতে পারেন। এর ফলে শিক্ষার্থীদের পড়ার চাপ খানিকটা কমে যায়।
3. শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের নিয়ে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত কোন ঘটনা অথবা পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়কে অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিনোদন হতে পারে ।
4. শ্রেণিকক্ষে পরস্পরের মধ্যে প্রশ্নোত্তর প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করতে পারে। এর ফলে প্রশ্ন কীভাবে করা হয় এবং তার সঠিক উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি কী, এ ব্যাপারে তারা জ্ঞান লাভ করতে পারবে । এ বিষয়ে শিক্ষক তাদের সাহায্য করবেন ।
5. আবৃত্তি (Recitation), বাগ্মিতা (Elocution), বিতর্ক (Debates), আলোচনা (Discussions) র আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতিভাকে সর্বসমক্ষে আনা যায়। এর ফলে সবার সামনে নিজেকে প্রকাশ করার ভয় থেকে তারা মুক্ত হবে ।
6. চিত্রাদি সংগ্রহ ও সংকলন (Albums and Collection Books), দেওয়াল পত্রিকা (Wall Magazine), মুদ্রিত পত্রিকা (Printed-magazine), সাহিত্য বৈঠক (Literary Sitting) সাহিত্য সংঘ (Literary Club) ইত্যাদির দ্বারা শিক্ষার্থীদের সাহিত্যের প্রতি রুচি ও তার রসোপলব্ধিতে সাহায্য করবে ।
7. বিশেষ বিশেষ দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (Cultural Function) আয়োজিত করে বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন রকমের কাজের সঙ্গে যুক্ত করে তাদের উপর দায়িত্ব বোধ জাগাতে ও সেই সঙ্গে গান - বাজনা - সাহিত্য প্রভৃতির প্রতি আগ্রহ জাগানো যেতে পারে ।

প্রস্তাবিত কার্য

1. পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক শব্দ তালিকা গঠন। শব্দগুলির অর্থ জানা এবং সেইগুলির সাহায্যে বাক্য তৈরি করা ।
2. পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে থেকে বিপরীত শব্দ, সমোচ্চারিত শব্দ, বাগ্‌ধারা ইত্যাদি বেছে লেখা ও সেইগুলির অর্থ জেনে বাক্যে প্রয়োগ করা।
3. অনুস্বার যুক্ত ও আনুনাসিক শব্দের সংকলন করে, তালিকা বানানো ।
4. বিভিন্ন ছবি শিক্ষার্থীকে দেখিয়ে তার সম্বন্ধে বর্ণনা করতে বলা ।
5. পাঠ্যপুস্তক থেকে পাঠ বেছে নিয়ে নানা ধরনের দশটি করে সৃজনাত্মক প্রশ্ন তৈরি করা ।
6. সচিত্র শব্দকোষ গঠন করা ।
7. বৌদ্ধিক মান নির্ণয়ের জন্য তর্ক - বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর, ক্যুইজ ইত্যাদির আয়োজন করা ।
8. পাঠ্যবস্তুর সঠিক বানান এবং অর্থ শেখার জন্য অভিধানের সাহায্য গ্রহণ করা ।
9. বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষণ সম্পর্কিত পাঁচটি পরিকল্পনা গঠন ।
10. ভাষাগত সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ ।
11. নানারকম হস্তশিল্প তৈরি ও ছবি আঁকায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা ।

প্রস্তাবিত পাঠ

1. প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের অধ্যয়ন
2. শিক্ষা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
3. ছোটদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকা (শুকতারা, আনন্দমেলা, শিশুসাথী, পাঠশালা, জলছবি, পক্ষীরাজ প্রভৃতি)
4. বিভিন্ন শিশু ও কিশোর সাহিত্য (রূপকথা, নীতিকথা, বিখ্যাত ব্যক্তিদের রচিত নানা ধরনের গল্প ইত্যাদি)
5. নানারকম ছড়া ও কবিতার বই
6. মণীষীদের জীবনী
7. বিহারে বাংলা সাহিত্য - নন্দদুলাল রায় (বিহার বাংলা একাডেমি)
8. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
9. ভাষার ইতিবৃত্ত — সুকুমার সেন
10. উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ-শ্রী বামনদের চক্রবর্তী
11. রক্তে ভাষা মাতৃভাষা — নির্মলেন্দু শাকারু ও জীবনকুমার সরকার
12. চলন্তিকা
13. সংসদ বাংলা অভিধান
14. বাংলা বানান অভিধান - পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি
15. নতুন বানান অভিধান — ড. বাসুদেব সাহা

সারাংশ

বাংলা ভাষার শিক্ষাদানের সার্থকতা তখনই লাভ করা যায়, যখন তার যথার্থ মূল্যায়ন হয়। বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, তার প্রকৃত স্বরূপ শিক্ষার্থীদের কাছে প্রকাশিত হয় শিক্ষকের দ্বারা । শিক্ষক তার ছাত্র - ছাত্রীদের বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার পর এই ভাষায় তাদের দক্ষতা নিরূপণ করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের ভাষা - কুশলতার পরিচয় নেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। শ্রেণি কক্ষে কীভাবে পড়ালে শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে ও তাদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল বাড়বে তারজন্য শিখন পরিকল্পনা (Learning Plan) তৈরি করতে হবে। শিক্ষণ - শিখন উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তিকে বাড়িয়ে, শিক্ষার্থীর মনে প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টি করে বিষয়কে স্পষ্ট, সহজ, আনন্দময় ও আকর্ষিত করে তুলতে হবে। বাংলা ভাষার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বাংলায় প্রশ্নপত্র নির্মাণের বিশিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেন শিক্ষক । ভাষা শিক্ষার মূল্যায়ন এবং তার ফল প্রকাশের প্রণালী শিক্ষার্থীদের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলে। যথাযথ পরিকল্পনা

অনুযায়ী শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব হয়।

অনুশীলনী

1. বাংলা ভাষার দক্ষতা নিরূপণের উদ্দেশ্যগুলি লেখো ।
2. শিক্ষণ - শিখন উপকরণ বলতে কী বোঝো ? ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা কী ?
3. শিক্ষণ - শিখন উপকরণের বিভিন্ন প্রকারগুলি সম্বন্ধে লেখো ।
4. মূল্যায়ন কাকে বলে ? মূল্যায়ন সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখো ।
5. শিখন পরিকল্পনা বলতে কী বোঝো ?
6. চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের কোন গদ্যাংশ অবলম্বনে একটি শিখন পরিকল্পনা তৈরি করো ।
7. দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য ২০ পূর্ণমানের একটি কর্মপত্র তৈরি কর ।
8. টীকা লেখো —

   A. শিখন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

   B. শ্রুতি - দৃশ্যনির্ভর উপকরণ

   C. সমষ্ঠিগত মূল্যায়ন ।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

সহায়ক গ্রন্থ ঃ-

- সেন সুকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, 2016
- সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, 2015
- বন্দোপাধ্যায় ড. অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, 2015 মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, 1992
- গোস্বামী ড. কৃষ্ণপদ, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, করুণা প্রকাশনী, 2016
- চক্রবর্তী বামনদেব, উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, অক্ষয় মালঞ্চ, 2018
- মিশ্র সত্যগোপাল, বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি, সোমা বুক এজেন্সী, 1994
- মিশ্র ড. অশোককুমার, সাহিত্যের রূপরীতি কোষ, সাহিত্য সঙ্গী, 2009
- মিশ্র ড. সুবিমল, বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), রীতা পাবলিকেশন 2013-14
- গুপ্ত অশোক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, 2014
- ঢালী ড. সন্তোষকুমার, বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ব্যবহারিক বাংলা, দিকদর্শন প্রকাশনী লিমিটেড, 2021
- রাহা ড. সুজাতা, বসু বৈশালী, ভাষা শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রযোগ (বাংলা), আহেলী পাবলিশার্স, 2021
- বন্ধু (চ্যাটার্জী) ড. মহুয়া, বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ, দেশ পাবলিকেশন, 2020
- মিশ্র ড. সুবিমল, প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণে বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি, রীতা পাবলিকেশন 2021-22
- মুখোপাধ্যায় দুলাল, হালদার তারিণী, চন্দ বিনায়ক, সমকালীন ভারতবর্ষ ও শিক্ষা, আহেলী পাবলিশার্স, 2016
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা ভাষার ইতিহাস, মৌলা ব্রাদার্স, 2006
- চট্টোপাধ্যায় সুনীতি কুমার, ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা পাবলিকেশন ইন্ডিয়া লিমিটিড, নতুন দিল্লী, 1939
- অধ্যয়ণ সামগ্রী, বাংলা ভাষা শিক্ষণ (চতুর্থ সত্র) এস.সি.ই.আরটি, পাটনা, 2017
- জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020 , শিক্ষা মন্ত্রক, ভারত সরকার, 2020
- জাগৃতি স্বাধ্যায় সামগ্রী, এস.সি.ই. আর.টি. পাটনা, 2012
- বধেকা গিজুভাই, দিবাস্বপ্ন, ন্যাশনাল বুক ট্রস্ট অফ্ ইন্ডিয়া, নতুন দিল্লী
- বিহার পাঠ্যচর্যা রূপরেখা, 2008, সার সংক্ষেপ, ইউনিসেফ
- ত্রিপাঠী ড. জ্ঞানদেব মণি, সিংহ রাবত বীরেন্দ্র, সম্পাদন, শিক্ষাকে বুনিয়াদী বিচার, এস.সি.ই. আর.টি. পাটনা, 2013
- সেবারত শিক্ষকো কে লিত্র ব্যবসায়িক দক্ষতা প্যাকেজ (হিন্দী)

- ✪ সিংহ সন্ধ্যা কপুর কার্তি, সমঝ কা মাধ্যম-রাষ্ট্রীয় পরিসংবাদ, 2008-10 পর আধারিত, এন.সি.ই. আর.টি. নিউ দিল্লী, 2015

অভিধান গ্রন্থ ঃ

- ✪ বিশ্বাস শৈলেন্দ্র, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, সপ্তম মুদ্রণ, 1989
- ✪ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দ কোষ, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, 2004
- ✪ ভট্টাচার্য রমেন, বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, 2014
- ✪ বন্দ্যোপাধ্যায় সুরভি, সাহিত্যের শব্দার্থ কোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গালা অকাদেমী, কলকাতা, 2014

সহায়ক ওয়েবসাইট ঃ

- DIKSHA Link : http://play.google.com /store/apps/details? id=in.gov.diksha.app & referrer = utm_source% 3D mobile % 26 utm_campaign% 3Dshare_app
- NISHTHA App : http://play.google.com /store/apps/details? id=ncert.ciet.nishtha
- e-lots App : http://play.google.com /store/apps/details? id=com. bepc. elots
- NCF - 2005 : www.ncert.nic.in.ncf 2005
- NEP - 2020 : www.wikipedia.org / wiki / national education on policy 2020
- BCF - 2008 : www.scert.bihar.gov.in.Bct 2008

✪

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार

तमसो मा ज्योतिर्गमय